পঞ্চম অধ্যায়

'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮) - উপন্যাসের পদধ্বনি

ডিরোজিও'র বিশেষ অনুগামী এবং ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' - এই ছদ্মনামে বাংলাসাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি উনিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে বাংলা রচনার সংখ্যা এগারোটি। অনেক বিচিত্র ধরণের পুস্তক পুস্তিকা লিখলেও তাঁর খ্যাতির উৎস 'আলালের ঘরের দুলাল'। প্যারীচাঁদের অন্যান্য রচনাগুলোর মধ্যে 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯)', 'রামারঞ্জিকা'(১৮৬০) 'গীতাঙ্কুর'(১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ'(১৮৬৫), 'অভেদী'(১৮৭১), 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত'(১৮৭৮), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা'(১৮৭৯), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০), 'বামাতোষিনী'(১৮৮১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়াও তাঁর অন্যান্য কয়েকটি রচনাকে যদিও অনেকেই উপন্যাসের অল্পবিস্তর লক্ষণাক্রান্ত বলেছেন,[১] প্রকৃতপক্ষে প্যারীচাঁদ মিত্র এই গ্রন্থটির জন্যই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পথিকৃৎ এর মর্যাদায় ভূষিত। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীতে 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস তথা নভেল অর্থেই পরিগণিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মননশীল লেখক ও সমালোচকেরা'আলালের ঘরের দুলালের দুর্বলতা ও ত্রুটি নির্দেশ করেও গ্রন্থটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাদের এই অনুভব বা উপলব্ধিকে ভিত্তিহীন বা অযৌক্তিক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু শুধু তাদের সাক্ষ্যকে নির্ভর করে রচনাটির উপন্যাস লক্ষন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া অনুচিত। আর এই জন্যেই'আলালের ঘরের দুলালকে আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নভেলের বিষয় ভাবনা ও শিল্পশৈলীর বিচারের জন্য 'আলালের ঘরের দুলাল'এর বিভিন্নমুখী আলোচনা প্রয়োজন। সেজন্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করে আমরা এবার আলোচনায় অগ্রসর হবো —

ক) সাধারণ পরিচয়

খ) চরিত্র পরিকল্পনা

গ) নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

ঘ) ভাষাবিন্যাস

ঙ) বাস্তবতা প্রসঙ্গ

চ) আঙ্গিক বিচার

ছ) সামগ্রিক মূল্যায়ণ

ক) সাধারণ পরিচয়

'আলালের ঘরের দুলাল'এর কাহিনী ত্রিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রতিটি অধ্যায়ের শীর্ষে একটি করে ব্যাখ্যাধর্মী নাম আছে। এই নামের মধ্যেই অধ্যায়টির পরিচয় বা ঘটনাংশের সারসংকলন নিহিত। সংক্ষেপে কাহিনীটি নিম্নরূপ —

বৈদ্যবাটির বাবুরামবাবু নানাউপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে একজন প্রভাবশালী বাবু হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর একপুত্র ও দুই কন্যা। কন্যাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর ব্যয় করে কুলীন ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। কুলীন জামাতারা অনেক স্থানে দারপরিগ্রহ করায় বিশেষ পারিতোষিক না পেলে বৈদ্যবাটির অভিমুখী হতো না। কন্যা যোক্ষদা বিধবা, এবং প্রমদার ভাগ্যে কুলীন স্বামীর সাক্ষাৎ ঘটে না। তারা বৈদ্যবাটিতেই থাকে।

অন্যদিকে পিতামাতার অত্যধিক আদরে পুত্র মতিলাল বাল্যকালেই অবাধ্য হয়ে উঠে। প্রথম প্রথম বিদ্যাভ্যাস করতে গিয়েই সে কান্নাকাটি করে গুরুমশাইকে আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে। গুরুমশাই মতিলালকে শিক্ষাদানে অসমর্থ হ'লেও বাবুরামের অনুরোধে সে দায়িত্ব

তাকে বহন করতেই হয়। এর ফলে গুরুমশাই কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি মতিলালের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে মতিলালের কথানুযায়ী বাবুরামবাবুর কাছে মতিলালের বিদ্যাশিক্ষার সুখ্যাতি করেন। বাবুরামবাবু এতে আনন্দিত হন এবং পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার অগ্রগতির কথা ভেবে তাকে ব্যাকরণ পড়ানোর জন্য বাড়ির মুখ্য-পূজারীকে ঠিক করেন। মতিলালের দৌরাত্ম্যে পূজারি ব্রাহ্মণও বাবুরামবাবুকে মতিলালের অসাধারণ মেধার কথা জানিয়েছে। এরপর শুরু হয়েছে মতিলালের ফার্সী পড়া। মতিলাল একদিন মুন্‌শী সাহেবের দাড়িতে জ্বলন্ত টিকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। মুনশী সাহেবের দুর্গতির জন্য বাবুরামবাবু মতিলালকে কিছুই বলেননি, উল্টে মুনশীসাহেবকেই দায়ী করেন। এবং মতিলালকে বর্তমানকালের উপযোগী ইংরেজি শিক্ষা দেবার মনস্থ করেন।

ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাবুরামবাবু বালীর বেণীবাবুর বাড়িতে মতিলালকে পাঠিয়ে দেন। অতি আদরে মতিলালের চরিত্র এমনভাবেই তৈরি হয়েছিল যে একদিনেই বালীর প্রতিটি গৃহস্থ এবং বেণীবাবু অতিষ্ট হয়ে উঠলেন। এবং পরদিনই বৌবাজারের নিঃসন্তান বেচারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মতিলালের থাকার ব্যবস্থা করেন। মতিলাল শরবোরণ সাহেবের স্কুলে ভর্তি হয়। কিন্তু শরবোরণ সাহেবের স্কুলে দু'একদিন পড়াশোনা করে সে কালুস সাহেবের স্কুলে ভর্তি হয়। বেচারামবাবুর দুজন মাতৃপিতৃহীন ভাগ্নে ছিল। তাদের সঙ্গী হিসেবে পেয়ে সে আরো অধঃপাতে যায়। কুসঙ্গ ও কুকর্মের ফলে মতিলালকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায়।

এই সংবাদ পেয়ে বাবুরামবাবু স্তব্ধ হয়ে যান। এসম্পর্কে তিনি গৃহিনীর সঙ্গে আলোচনা করেন। গৃহিনীর কোলে তখন আর একটি ছেলে। মতিলালের এই সংবাদে তিনি খুব অস্থির হন। বাবুরাম বাবু ভেবেচিন্তে মোকাজান মিয়া ওরফে ঠকচাচাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় বাঞ্ছারামের বাড়ীতে উপস্থিত হন। বাঞ্ছারাম বালির সাহেবের মুৎসুদ্দি।

আইন আদালত-মামলা-মোকদ্দমায় ধড়িবাজ। শেষপর্যন্ত ঠকচাচার প্রচেষ্টায় মিথ্যাসাক্ষীর মাধ্যমে, তত্ত্ব, তদ্বির করে মতিলালকে পুলিশের হাত থেকে মুক্ত করা হয়।

তাকে নিয়ে বৈদ্যবাটিতে ফেরার পথে বাবুরামবাবুদের নৌকো ঝড়ের কবলে পড়ে। বাবুরামবাবুর নৌকো ডুবির আশংকায় বৈদ্যবাটিতে সবাই উৎকণ্ঠিত হয়। শেষ-পর্যন্ত মতিলাল ঠকচাচাসহ বাবুরাম বাবুর প্রত্যাগমনে সেই উৎকণ্ঠার পরিবর্তে আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখা দেয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হ'লো পুলিসের হাত থেকে আনার পরও মতি-লালের স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং মাতা-পিতার আদর বেড়ে যাওয়ায় তার দৌরাত্ম্য ও রঙ-তামাসার পরিমান আরো বাড়ে। কয়েকদিন পরে মতিলালের সঙ্গী হলধর-গদাধর জেল থেকে খালাস পেয়ে মতিলালের সঙ্গে এসে জোটে। তাছাড়া পাড়ার বকাটের দলতো ছিলই। মতিলাল ক্রমশঃ ভীষণ দুরাচারী হয়ে ওঠে। পথচারী এক ভদ্রকন্যার প্রতি সে অভদ্র আচরণ করতেও দ্বিধা করেনি। অবশ্য মতিলালের মায়ের সাহায্যে মেয়েটি মতি-লালের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ন্যায়নিষ্ঠ বরদাপ্রসাদ বাবু এবং বেণীবাবুর অনিচ্ছায়, ঠকচাচার পরামর্শে মানিকরায়পুরের দাঙাঁবাজ লোক মাধববাবুর কন্যার সঙ্গে মতিলালের বিয়ে স্থির হয়। ঠকচাচাকে কেন্দ্র করে বিয়ে বাড়িতে কথাকাটাকাটি থেকে মারামারির উপক্রম হয়।

অন্যদিকে বরদাপ্রসাদবাবুর সান্নিধ্যে বাবুরামবাবুর ছোট ছেলে রামলাল সচ্চরিত্র হয়ে উঠেছে। বরদাপ্রসাদ বাবুর উপদেশে ও ধর্মনিষ্ঠায় রামলালের চরিত্র ক্রমশ ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ হওয়ায় পাড়া-প্রতিবেশীদের সে আদরের পাত্রও হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয় রক্ষাকল্পে রামলাল সম্পর্কে বাবুরামবাবুর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তাঁর এই সন্দেহকে আরো বাড়িয়ে দেয় ঠকচাচা। ধর্মনিষ্ঠ রামলাল বড়ো ভগিনীর পীড়ায় যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করে। অন্যদিকে ঠকচাচার চক্রান্তে বরদাপ্রসাদবাবুর বিরুদ্ধে গুমখুনের অভিযোগ

ওঠে। তবে শেষপর্যন্ত বরদাপ্রসাদ বাবু এই চক্রান্তের জাল থেকে মুক্ত হন।

যতিলাল পীড়িত ভগিনীকে দেখতেও যায়নি। দলবল নিয়ে সে নানা কুকাজে করে বেড়ায়। একদিন দলবল নিয়ে একজন কবিরাজকে নাজেহাল করে। রামলালের ধর্ম-নিষ্ঠতা এবং যতিলালের উচ্ছন্নে যাওয়ার ফলে বাবুরামবাবু তার বিষয় রক্ষার্থে ঠক-চাচার পরামর্শের উপর নির্ভর করেন। ঠকচাচার পরামর্শে বিষয়রক্ষার জন্য বাবুরামবাবু বৃদ্ধবয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহে স্বীকৃত হন। বেণীবাবু ও বেচারামবাবু এই বিয়ে থেকে বাবুরামবাবুকে বিরত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকে এই বিয়ে থেকে নিরস্ত করতে পারেননি। বাবুরামবাবুর বক্তব্য বড়ছেলে যতিলাল উচ্ছন্নে গেছে, রামলালও ধার্মিক হয়ে বিষয়রক্ষার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর একটি মেয়ে মারা গেছে। প্রায় বিধবা আর একটি মাত্র মেয়ে ঘরে আছে। তাঁর বংশ শেষ হওয়ার পথে। ফলে বংশ রক্ষার্থে তার দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রয়োজন। তাছাড়া কনের বাবার অনুরোধ কুল রক্ষার জন্য তিনি যেন মেয়েটিকে বিবাহ করেন। ঠকচাচার মতে এই বিবাহে প্রচুর টাকাও আসবে বাবুরামবাবুর ঘরে।

বিয়ের কিছুদিন পরে বাবুরামবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ পিতাকে রামলাল প্রাণপণ সেবাশুশ্রূষা করে। অথচ বাবুরামবাবু যতিলালকে ডেকে পাঠালেও সে দেখতে আসেনি। বরদাপ্রসাদবাবু, বেণীবাবু, বেচারামবাবু সবাই বাবুরামবাবুকে দেখতে আসেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মারা যান।

বাবুরামবাবুর মৃত্যুর পর ঠকচাচা ও বাচ্ছারামের কুচক্রে, তাদের কথামতো যতিলাল পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে বিপুল ঋণে জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলেরও সূচনা হয়। পিতার মৃত্যুর পর যতিলাল জমিদারী গদি লাভ করে এবং তার বাবুয়ানা আরো বেড়ে যায়। সে দলবল নিয়ে আপনসুখে মত্ত হয়ে তার মায়ের প্রতি কুব্যবহার করে। তার মা ও ভগিনী সেই দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ঠকচাচাও বাচ্ছা-রামের পরামর্শে সে রামলালকেও বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে। এর ফলে রামলালও মা ও

ভগিনীর সঙ্গে দেখা না করে দেশান্তরে চলে যায়।

এদিকে যতিলালের জমিদারীতে অর্থাভাব দেখা দেয়। এর ফলে বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা তাকে সওদাগরী কাজ করার পরামর্শ দেয়। এ সম্পর্কে যতিলালের কোনো ধারণাই নেই, তবুও সদলবলে সওদাগরী কাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ঠকচাচা ও বাঞ্ছারামের পরামর্শে বাবুয়ানীর অতি বাড়াবাড়িতে সওদাগরী করে যতিলাল ঋণে জর্জরিত হয়। অন্যদিকে ঠকচাচা ও বাঞ্ছারাম যতিলালের ব্যবসার নামে নিজেদের অর্থলিপ্সাকে পূর্ণ করে। অবশেষে সর্বস্ব শেষ করে যতিলাল নিজবাড়িতে পালিয়ে আসে। জালিয়াতির দয়ে ঠকচাচাকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে জেনে যতিলালেরও আতঙ্ক দেখা দেয়। এমন সময়ে বাবুরামবাবুর সর্বাপেক্ষা লাভের তালুক যশোহরের কথা যতিলালের মনে আসে। সে সদলবলে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু বিষয়কর্মে দেখার যতোর যতো বুদ্ধি তার ছিল না। চরিত্র তার অসৎ, এবং সঙ্গীরাও স্বার্থপর হওয়ার ফলে যশোহরেও তার সুবিধে হয়নি। উপরন্তু নীলকরসাহেবদের সঙ্গে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত নীলকর সাহেবদেরই জয় হয়। আদালতে ঠকচাচা ও তার এক সঙ্গীবাহুল্যের জালিয়াতি প্রমাণিত হয়। বাঞ্ছারামের দৌড়াদৌড়িতেও বিচারে শেষপর্যন্ত ঠকচাচার দ্বীপান্তর হয়

বাঞ্ছারামের কুচক্রে বৈদ্যবাড়ি ক্রোক হয়। তার দুর্ব্যবহারে যতিলালের স্ত্রী ও বিমাতার যারপরনাই ক্লেশ হয়। তারা বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়। শেষে বরদাপ্রসাদ-বাবু তাদের আশ্রয় দেন।

এদিকে আঘাতে, অর্থাভাবে, বাবুয়ানির খোলস হারিয়ে যতিলালের চেতনা ফেরে। সংকটে পড়ে প্রকৃত আত্মীয় বন্ধু কারা - তা সে বুঝতে পারে। কপর্দকশূণ্য হওয়ায় সঙ্গীরাও তাকে পরিত্যাগ করে। শেষে যতিলাল পদব্রজে কাশীধামের দিকে যাত্রা করে। সেখানে

এক সাধুর সান্নিধ্যে তার মনের কালিমা দূর হয়। তার যেন নবজন্ম হয়। অন্যদিকে যতিলালের মা ভগিনী মথুরার পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতে বেড়াতে একদিন বরদাবাবু ও কনিষ্ঠপুত্র রামলালের সাক্ষাৎ পায়। তারা সকলে বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করে। পথে বারাণসীধামে যতিলালের সঙ্গেও তাদের দেখা হয়ে যায়। যতিলালের সুমতি দেখে তারা সবাই আনন্দিত হয়। এবং সবাই মিলে বৈদ্যবাটিতে ফিরে আসে। যিনি যতিলালের বাড়ি দখল করেছিলেন তিনি স্বেচ্ছায় তা ফিরিয়ে দেন। তারা সুখে সংসার করতে থাকে।

খ) চরিত্র পরিকল্পনা

নভেল অর্থে উপন্যাসের অপরিহার্য শর্ত হ'লো জীবনের সত্যতা। জীবনের এই সত্যতার রূপায়ণ ঘটে চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে। 'আলালের ঘরের দুলাল'এ বিভিন্ন ধরণের চরিত্র চিত্রণ লক্ষ করা যায়। একদিকে রয়েছে বেণীবাবু, বরদাপ্রসাদবাবু, বেচারামবাবু এবং রামলালের মতো খুব ভালো আদর্শ চরিত্র। অন্যদিকে রয়েছে হলধর, গদাধর, বাঞ্ছারাম, দোলগোবিন্দ এবং ঠকচাচার মতো খারাপ মানুষেরা। আর আছে নায়ক যতিলাল। অনেক-কাল মন্দ থাকার পর যে হঠাৎ ভালো হয়ে গেলো। তার বাবা বাবুরামবাবু যেমন আদর্শ চরিত্রের মধ্যে পড়ে না, তেমনি খারাপ চরিত্রদের সঙ্গেও তাকে একেবারে মিলানো যায় না। এছাড়া যতিলালের মা, স্ত্রী ও ভগিনীদুয়ের পরিচয়ও পাওয়া যায়। সমালোচকের মন্তব্য : "আলালের ঘরের দুলালে'র মধ্যেই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রসৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়াছে।" [২] উপন্যাসের আলোকে এই চরিত্রসৃষ্টি কতোটা সার্থক হয়ে উঠেছে তাই আমাদের বিচার্য বিষয়।

যতিলাল : যতিলালকে ঘিরে আখ্যায়িকার উৎপত্তি, বিকাশ এবং পরিণতি। যতিলালই এই আখ্যায়িকার নায়ক। ঔপন্যাসিকেরা চরিত্রবিকাশের ক্ষেত্রে দুটি পথকে গ্রহণ করেছেন —

> যাঁরা চরিত্রের সময়ানুক্রমিক বিকাশ দেখাতে অভ্যস্ত বা সেইভাবেই বিকাশ দেখাতে চান, তাঁদের কাহিনীতে প্রথমে চরিত্র-ধারণা পাঠকের কাছে অস্পষ্ট রাখা হয়, পরে কাহিনীর মধ্যে ধীরে ধীরে তার পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ পায়। আবার কখনো কখনো, চরিত্রের প্রথম আবির্ভাবে তার যে বিবরণ দেওয়া হয়, তার মধ্যে চরিত্রের ভাবী পরিণতির আংশিক ইঙ্গিত থাকে।[৩]

'আলালের ঘরের দুলাল' এ যতিলালের প্রথম পরিচয় থেকে আমরা জানতে পারি —

> যতিলাল বাল্যাবস্থা অবধি আদর পাইয়া সর্বদাই বাইন করিত, - কখন বলিত। 'বাবা, চাঁদ ধরিব' - কখন বলিত 'বাবা তোপ খাব'। ... প্রথম প্রথম গুরু মহাশয়ের নিকটে গেলে যতিলাল আঁ আঁ করিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে আঁচড় ও কামড় দিত, গুরুমহাশয় কর্ত্তার নিকট গিয়া বলিতেন, "মহাশয়! আপনার পুত্রকে শিক্ষা করান আমার কর্ম্ম নয়।" কর্ত্তা প্রত্যুত্তর দিতেন - " ও আমার সবেধন নীলমণি - ভুলাইয়া টুলাইয়া গায় হাত বুলাইয়া শেখাও।"[৪]

যতিলাল চরিত্রের এই প্রাথমিক বর্ণনা থেকে তার চরিত্রের অনেকটাই আভাসিত। একই সঙ্গে পিতামাতার অস্বাভাবিক প্রশ্রয়ের উল্লেখও করা হয়েছে। এই প্রশ্রয়ের ফলেই যতিলাল উচ্ছন্নে গেছে। কাহিনীর মধ্যে তার প্রমাণ ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু তার এ পরিচয়ও সম্পূর্ণ নয়। সর্বস্বান্ত হয়ে, সঙ্গীত্যাগী হয়ে হঠাৎ সে ভালো হয়ে যায়। তাই যতিলালের প্রাথমিক বর্ণনার সঙ্গে ক্রমবিকাশের মিল থাকলেও পরিণতির কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রথম থেকেই সে গুরুমহাশয়কে আচড়ে দিয়েছে কামড়ে দিয়েছে। এর পরে পাঠে সে রীতিমতো ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু পিতামাতার আদুরে দুলাল এর জন্য শাস্তি পায়নি। পূজারী ব্রাহ্মণের উপরে তার ব্যাকরণ শিক্ষার দায়িত্ব পড়লে সোজাসুজি টাকা দিয়ে বলেছে: " এই নে , কিন্তু বাবার গিয়া বলগে, আমি সব শিখেছি।"[৫] পূজারী ব্রাহ্মণ যতিলালের ভয়ে তাই করেছে। এভাবে ক্রমাগত তার দৌরাত্ম্য বেড়েছে। এই দৌরাত্ম্যের পূর্ণ

পরিচয় পাওয়া যায় বালিতে। ইংরেজি শিক্ষার অভিলাষে বাবুরামবাবু তাকে বালিতে বেণীবাবুর বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। এক রাতেই সে ঐখানে এমনই অতিষ্ট করেছিল যে বেণীবাবু বাধ্য হয়ে পরদিন তাকে বৌবাজারে বেচারামবাবুর বাড়িতে রেখে আসেন।

বেচারামবাবুর বাড়িতে তার সঙ্গী জোটে হলধর, গদাধর। তার যা ইচ্ছে হয়, সেখানে সে তাই করে। দিন দিন তার কুস্বভাব ও কুমতি-বৃদ্ধিই পেতে থাকে। অবশেষে জুয়াখেলার দায়ে তাকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। পিতা বাবুরামবাবু ঠকচাচার সাহায্যে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করেন। এতেও তার শিক্ষা হয়নি। দলবলসহ সে ক্রমশ: দুরাচারী হয়ে উঠে। একদিন সে পথচারী ভদ্রকন্যার প্রতি অভদ্র অত্যাচার করতেও দ্বিধা করেনি।

মতিলালের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পরেও তার চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। দলবলসহ তার তামাসা, ফষ্টিনষ্টি অব্যাহত থাকে। স্ত্রীর প্রতি তার কোনো আকর্ষণ বা ন্যূনতম কর্তব্যবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায় না। যে পিতার আদরে মতিলাল ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে সেই পিতার মৃত্যুকালে সে দলবল নিয়ে বাগানবাড়িতে অবস্থান করেছে। অথচ তাকে দেখার জন্য পিতার ইচ্ছে জানা সত্ত্বেও সে দেখা করতে যায়নি।

বিষয়কর্মে অনভিজ্ঞ মতিলাল পিতার মৃত্যুর পর ঠকচাচা ও বাঞ্ছারামের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। তার বাবুয়ানা তখন আরো বেড়ে যায়। মায়ের প্রতি সে কুব্যবহার করে। মাকে প্রহার করে। ছোট ভাই রামলালকেও বাড়িতে প্রবেশ করতে বারণ করে। এর উদ্দেশ্য পিতার সম্পত্তির সর্বময় কর্তা হওয়া। ঠকচাচা ও বাঞ্ছারামের বুদ্ধিতে মতিলাল ব্যবসায় নেমে সর্বস্বান্ত হয়। কপর্দকহীন মতিলালকে তার সঙ্গীরা ত্যাগ করে। অর্থাভাবে সঙ্গীহীন হয়ে তার চেতনা জাগে। পদব্রজে সে কাশীধামে রওনা হয়। সেখানে এক সাধুর সৎ উপদেশ ও সঙ্গ তার মনের কালিমাকে দূর করে। তার আচার আচরণেও পরিবর্তন আসে । এই

পরিবর্তনের ফলস্বরূপ লেখক বলেছেন —

> ... দুরবস্থায় পড়িয়া ক্রমাগত একাকী চিন্তা করাতে, তাহার মনের গতি বিভিন্ন হইতে লাগিল। ... মনের এবম্প্রকার গতি হওয়াতে তাঁহার আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মিল এবং ঐ ধিক্কারে অত্যন্ত সন্তাপ হইতে লাগিল। তখন আপনাকে সর্বদা এই জিজ্ঞাসা করিতেন - "আমার পরিত্রাণ কিরূপে হইতে পারে ? আমি যে কুকর্ম করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে।" [৬]

মতিলালের চরিত্রপরিবর্তনের দিকটির প্রতি লক্ষ করেই জনিক সমালোচক মন্তব্য করেন —"তার নায়কসত্তা চরিতার্থ হয়েছে এবং লেখকের উপন্যাস রচনাও সফল হয়েছে।" [৭] কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় বাল্যে মতিলাল যেমন দুষ্টবুদ্ধি, বয়সেও তাই। সে বেশ বোকাটে এবং স্থূল স্ফূর্তিবাজ। পিতা বাবুরামের মতোই ব্যক্তিত্বহীন। তবে পিতার মতো অন্ধ স্নেহবোধ তার নেই। নেই কোনো হৃদয়াবেগ। তাঁর চরিত্রের এই আকস্মিক পরিবর্তন, চারিত্রিক উন্নতির বীজ তার স্বভাবের মধ্যে ছিল না। প্রথমাবধিই মতিলাল অস্থির অবাধ্য। বিয়ের পরেও তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়নি। বাবুরামবাবুর মৃত্যুর পর তার বাবুয়ানা আরো বেড়েছে। কিন্তু শেষ অধ্যায়ে সঙ্গীহীন কপর্দকহীন হয়ে তার বিবেক দংশন হয়েছে। আত্মগ্লানিতে পুড়ে এবং গুরুর সদুপদেশে সে মানবিকতার উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের এই সহসা পরিবর্তন, চারিত্রিক বিপরীত্যে এই আকস্মিক উত্তরণ লোকসাহিত্যেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। [৮]

কখনো কখনো দেখা যায় যদি একটা চরিত্র হঠাৎ কোনো কারণে খুব ভালো হয়ে যায়, বাকি জীবন ভালোভাবেই কাটিয়ে দেয়। ধর্মীয় লোককথায় এ ধরণের চরিত্র-পরিবর্তনের ব্যাপার থাকে। বুদ্ধদেবের প্রভাবে অঙ্গুলিমালের পরিবর্তন, বুদ্ধশিষ্যের প্রভাবে কৃপণ কশ্যপের, যীশুখ্রীষ্টের প্রভাবে যেরী ম্যাগডালেনের পরিবর্তন - এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

প্যারীচাঁদ অবশ্য দেখিয়েছেন যে জীবনে ঘা খেয়ে, কিছুদিন সাধুসঙ্গে বাস করে মতিলালের জীবনে পরিবর্তন এসেছে। তবে এ পরিবর্তন অতিদ্রুত। এই অবস্থায় মানুষের মনে দ্বন্দ্ব-সংকটের সৃষ্টি হয়। নানারকম চিন্তা অনুভূতি জট পাকিয়ে যায়। পরিবর্তনের পর্যায়ে চিন্তাধারার গতিবিধি হয়ে উঠে দুর্জ্ঞেয় - লেখক এই সমস্ত দিকগুলো পরিস্ফুট করে দেখাননি। আসলে জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটা তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায়না। "মানব সংসারে বাস করতে করতে মানুষের চরিত্রে যে বি-জাতীয় সব বিরোধী অনুভব অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, অনিবার্য হ'য়ে ওঠে নানান দ্বন্দ্ব জটিলতা, কালক্রমে যে মানুষের চারিত্রিক চলন কতোবার কতো বিচিত্রপথ অবলম্বন করতে পারে সে সব ব্যাপারে গুরুত্ব পায়নি টেকচাঁদে।" [১] অথচ লেখক মতিলালের মাধ্যমে সেদিকগুলো পরিস্ফুট করতে পারতেন। সে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার সুব্যবহার লক্ষ করা যায় না, প্রকৃতপক্ষে মানবমনের জটিলতা এখানে খুবই সরলীকৃত। লৌকিক রূপকথা ব্রতকথা, নীতিকথায় যা হয়ে থাকে তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় এখানে।

বস্তুত আখ্যায়িকার আবর্তন নির্ভর করেছে ঠকচাচার কার্যকলাপের উপর। মতিলালের পিতা বাবুরামবাবু যেমন ঠকচাচার বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়েছেন, বাবুরাম-বাবুর মৃত্যুর পর মতিলালও তারই বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়েছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে উপন্যাসোচিত নায়কের মর্যাদা এখানে ক্ষুন্ন হয়েছে। তবুও মতিলালকে কেন্দ্র করে আদি, মধ্য, অন্ত যুক্ত যে কাহিনী লেখক সৃষ্টি করেছেন সে কাহিনীর নায়ক মতিলাল। সমকালীন বাঙালির বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি মেলে মতিলালের মধ্যে। ধনীর দুলাল, বাবুগিরিতে মত্ত। বাবুগিরি বজায় রাখতে গিয়ে হয়েছে সর্বস্বান্ত। এদিক দিয়ে দেখলে মতিলাল জীবন্ত উদাহরণ। তার মধ্যে প্রাণসঞ্চারে লেখক সার্থক। সর্বোপরি, লোকসাহিত্যের আদলে হ'লেও সন্তাপিত মতিলাল শান্তির আধার গড়ে তুলেছে। শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ শেষে তার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে এবং সবাইকে ফিরে পেয়েছে। এর মাধ্যমে লেখক তাকে মানবিকতার উচ্চভূমিতে উত্তরণের প্রচেষ্টা করেছেন। এদিক দিয়ে দেখলে

অসম্পূর্ণ হ'লেও মতিলালই প্রথম উপন্যাসোচিত নায়কচরিত্র। আর প্যারীচাঁদের হাতেই বাংলা উপন্যাসের নায়ক চিন্তার শুভারম্ভ।

রামলাল : বাবুরামবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রামলাল। মতিলাল অসৎসঙ্গে এবং ঠকচাচা প্রমুখ কুচক্রীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ক্রমশঃ অধঃপতনের অতলে নিমজ্জিত হয়েছে, অন্যদিকে রামলাল বরদাবাবুর সান্নিধ্যে, সুনির্দেশে প্রথম থেকেই উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠেছে। নীতিহীনতাই উচ্ছৃঙ্খলতার মূল - এটা প্রতিপন্ন করার জন্য মতিলালের বৈপরীত্যে প্যারীচাঁদ রামলালচরিত্রের অবতারণা করেছেন। বিজ্ঞ ধর্মনিষ্ঠ বরদাবাবুর সান্নিধ্যলাভে রামলালের মনের এবং ভাবের সুন্দর এবং সংযত বিকাশ ঘটেছে। বরদা বাবুর সান্নিধ্যে রামলালের চারিত্রিক উন্নতি ঘটেছে সত্য, তবে সে উন্নতি আত্মিক উন্নতি। রামলালের ভগিনী এবং পিতার মৃত্যুশয্যায় তার অকৃত্রিম সেবা শুশ্রূষার কথা আমরা জানতে পারি। বাবুরামবাবুর মৃত্যুর পর জমিদারীতে একছত্রের অধিকারী হওয়ার বাসনায় মতিলাল তাঁকে বাড়িতে প্রবেশ করতে বারণ করেছে। এর বিরুদ্ধে রামলালের কোনো অভিযোগ নেই। বরং "রামলাল ভদ্রাসন প্রবেশ করণে নিবারিত হইয়া অনেক বিবেচনা করণান্তে মাতা বা ভগিনী অথবা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দেশান্তরে গমন করিলেন।" ১০

আসলে 'মায়াময়মিদমখিলম্' - এই মানসিকতায় লালিত এদেশের লোক। তাই তারা ইহজীবনকে কখনো চরম ও চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে পারেনি। দুঃখ জর্জরিত এই জীবনের পরে পুণ্যের ফলস্বরূপ স্বর্গলোক প্রাপ্তিই তাদের কাম্য। এই ধারণায় জন্মান্তরবাদী এদেশবাসী দুঃখের অভিঘাতে অবসন্ন হ'য়েও কখনো যুক্তি বা বিচারবোধের সাহায্যে জীবনকে পরিচালিত করতে চায়নি। নিজেদের অদৃষ্ট দৈবশক্তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র মনে করেছে। বিদেশী শিক্ষার সংস্পর্শে নূতন ভাবধারায় দেশবাসীর সামনে জীবনাগ্রহ প্রকাশ পেলেও বহুদিনের সংস্কারকে বর্জন করা সম্ভব হয়নি। পাপের শাস্তি, পুণ্যের জয় - এই

ফল ভোগ অনিবার্যভাবেই এসে গেছে। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ লেখক মতিলাল ও রামলালের চরিত্রে বিভিন্ন কর্মফলপ্রাপ্তির চিত্রপ্রদর্শনের মাধ্যমে এই দিকটায় আলোকপাত করেছেন। এর ফলে চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, টানা-পোড়েন, হৃদয়-ইত্যাদির সূক্ষ্ম পরিচয় এখানে অনুপস্থিত। এদিক দিয়ে দেখলে হানা কথেরীণ ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র ছায়া এখানে লক্ষ করা যায়।

বকাটে, অবাধ্য মতিলালকে জীবন্ত মনে হয় অনেক বেশি। কিন্তু ভালোর প্রতিভূ, আদর্শের পরাকাষ্ঠা, নীতিজ্ঞ রামলালকে আমাদের কাছাকাছি মনে হয়না। সে ভক্তির প্রতিমূর্তি। মা, বোন, ভাই বাড়ি - সবই ফিরে পেয়েছে রামলাল। কিন্তু এতে তার নিজের কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। সবকিছু ফিরে পেয়ে সে ভেবেছে : "জগদীশ্বর! তোমা হইতে কিনা হইতে পারে ?"[১১] এর ফলে চরিত্রশক্তি তার যতোদৃঢ়ই হোকনা কেন, উপন্যাসের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যে দ্বন্দ্ব-অভিঘাত তা তার মধ্যে প্রকাশিত হয়নি।

বরদাপ্রসাদবাবু : চরিত্রটি লেখকের আদর্শ প্রণোদিত সৃষ্টি। বাবুরামবাবুর বড়োপুত্র মতিলাল উচ্ছন্নে গেছে। অধিক বয়সে তাঁর আর একটি পুত্র হয়েছে রামলাল। রামলালের চরিত্রকে সৎ, ধর্মপরায়ণ, ভক্তিপরায়ণ, - আদর্শনিষ্ঠরূপে গড়ে তুলতে বরদা-বাবু চরিত্রটির অবতারণা। তিনি নৈতিক উচ্চমানের প্রতিনিধি। আসলে প্যারীচাঁদের "উন্নত নীতিবোধ ছিল, ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার আদর্শ দ্বারা নিজের জীবনে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।"[১১] ফলে তার সামনে শিক্ষাবিষয়ক, নীতিমূলক আদর্শ ছিল। আর এই আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্রে। তার অন্যতম উদাহরণ বরদাপ্রসাদ চরিত্র।

সদাচরণে তিনি সুতঃসিদ্ধ। সবসিদ্ধান্তে তিনি নির্ভুল। চরম আঘাতেও তিনি স্থির এবং সহিষ্ণু। এর ফলে মনে হয় চরিত্রটি সমকালীন নব্য আদর্শে সতর্কভাবে সৃষ্টি

করেছেন। কিন্তু সমকালীন নব্য আদর্শে গড়া হ'লেও যতোটা তত্ত্বকথা, ততোটা রক্তমাংসের নয়। আদর্শবাদের চাপে বরদাপ্রসাদ মানবপ্রকৃতির সব স্বাভাবিক দুর্বলতা থেকে উত্তীর্ণ। বরদাবাবুর জীবনাচরণে কোনো যন্ত্রণা নেই। নেই কোনো দ্বন্দ্ব, সদাচারী এবং সদালাপী চরিত্রের 'মডেল' হ'য়ে উঠেছেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য —

> একজন ভদ্রলোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন - আঘাতিত ব্যক্তির মস্তক দিয়া অবিশ্রান্ত রুধির নির্গত হইতেছে; ঐ রক্তে উক্ত ভদ্রলোকের বস্ত্র ভাসিয়া যাইতেছে। সারজন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে, ও এ লোকটি কি প্রকারে জখম হইল ?" ভদ্রলোক বলিলেন, "আমার নাম বরদা প্রসাদ বিশ্বাস - আমি এখানে কোন কর্ম অনুরোধে আসিয়াছিলাম, দৈবাৎ এই লোক আঘাতিত হইয়াছে, এই জন্য আমি আগুলিয়া বসিয়া আছি। শীঘ্র হাসপাতালে লইয়া যাইব তাহার উদযোগ পাইতেছি - একখানা পাল্কী আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু বেহারারা ইহাকে কোনমতে লইয়া যাইতে চাহে না; কারণ এই ব্যক্তি জেতে হাড়ি। ... সারজন বলিল -"বাবু - বাঙালীরা হাড়িকে স্পর্শ করে না। বাঙালী হইয়া তোমার এতদূর করা বড় সহজ কথা নহে। বোধ হয়, তুমি বড় অসাধারণ ব্যক্তি।[১২]

স্বভাবতই বরদাপ্রসাদবাবু এখানে সংস্কারমুক্ত সৎকাজে বদ্ধপরিকর। উনিশ শতকীয় চরিত্রের প্রতিনিধি রূপেই চিত্রিত। কিন্তু জীবনবোধের যে শৈল্পিক স্পর্শে চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে এখানে তা লক্ষ করা যায়না। এমনকি এই আদর্শ জীবনাচরণের কোনো তাৎপর্যকেও লেখক উপন্যাসের রস সূত্রে গ্রথিত করতে পারেননি।[১৩] বরদাপ্রসাদ পরোপকারে রত। কোনোরূপ যশের প্রত্যাশাও তাঁর নেই। ঠকচাচার চক্রান্তে তিনি মিথ্যে মামলায় পড়েছেন। যতিলাল নিজের বাবুয়ানাতে ব্যস্ত - নিজের পরিবারের প্রতি কখনো দৃষ্টি দেয়নি। যতিলালের সর্বস্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় তার স্ত্রী, বিমাতা ও একজন দাসী চরম অনকষ্টে পড়ে। ঠকচাচার দীপান্তর হয়। ফলে তার পরিবারেও দেখা দেয় অনাভাব। একথা জানতে পেরে বরদাবাবু বেচারামবাবু ও বেণীবাবুর সামনে বলেছেন —

তাহাদের উপবাসে দিন যাইতেছে; একথা শুনিয়া বড় দুঃখ হইল, এজন্য আমার নিকট যে দুইশত টাকা ছিল, তাহা আনিয়াছি। আপনারা আমার নাম প্রকাশ না করিয়া, কোন কৌশলে এই টাকা পাঠাইয়া দিলে, আমি বড় আপ্যায়িত হইব।[১৪]

শুধু তাই নয়। যতিলালের গৃহহীন বিমাতা ও স্ত্রীকে তিনিই আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর জন্যই যতিলাল ও রামলাল সবকিছু ফিরে পেয়েছে। তাঁর এরূপ আচরণ তাঁকে শুদ্ধচিত্ত ও ধার্মিক রূপে প্রতিপন্ন করেছে। ক্ষমা, ধৈর্য, দয়া পরোকার - ইত্যাদি প্রচুর গুণের সমাবেশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। প্রসঙ্গত - উল্লেখযোগ্য :"... রামলাল ও বরদাবাবু চরিত্র স্যাতস্ত্র্যের দিক দিয়া ম্লান ও বিশেষত্ব বর্জিত, কতকগুলি সদ্‌গুণের যান্ত্রিক সমষ্টিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।"[১৫] বস্তুত আদর্শের প্রতিমূর্তি রূপে চিত্রিত করতে গিয়ে চরিত্রটির স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

বেণীবাবু : বেণীবাবু ভালোমানুষ। তার আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বাবুরামবাবু তাঁর পুত্র যতিলালকে মানুষ করবার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বেণী-বাবুর উপরে। এতে বেণীবাবু বলেছেন : " ছেলেকে মানুষ করিতে গেলে ঘরে বাহিরে তদারক চাই।"[১৬] এর থেকে প্রতিপন্ন হয় তিনি অভিজ্ঞব্যক্তি। জুয়াখেলার অভিযোগে যতিলাল পুলিসে ধরা পড়লে বাচ্ছারাম, ঠকচাচা তাঁকে মিথ্যেসাক্ষ্য দেবার জন্য প্ররোচিত করেছে।

কিন্তু বেণীবাবু তাতে সম্মত হননি। কারণ তিনি অধর্ম করবেন না। বলা-বাহুল্য এই বোধ তাকে ব্যক্তি-সচেতন হিসেবে প্রতিপন্ন না করে আদর্শাবাদী হিসেবেই পরিচিত করে। তার মধ্যেও সব ভালোভালো গুণের সমাবেশ। তবুও তিনি অপরের মন্দ আচরণে বিরক্ত হ'তে বা ক্রুদ্ধ হ'তে জানেন। এর ফলে চরিত্রটির স্বাভাবিক স্ফুরণ না হ'লেও একটা মানবিক স্পর্শ পাওয়া যায়।

বেচারাম : 'আলালের ঘরের দুলাল'এ প্যারীচাঁদ সৃষ্ট ভদ্রচরিত্র এই বেচারাম। তবে তিনি বরদাপ্রসাদ ও বেণীবাবুর মতো ধৈর্যের ও ভক্তির প্রতিমূর্তি নন। ইংরেজি শিক্ষার জন্য যতিলাল তাঁর বাড়িতে ছিল। যতিলাল পুলিসে ধরা পড়লে তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন : " ... আমি জ্বালাতন হইয়াছি ... আমি আবার তাহাদের খালাসের জন্যে টাকা দিব ? দূর দূর ।" [১৭] তাছাড়া প্রাণ গেলেও তিনি অধর্ম করবেন না। বেণীবাবু, বরদাবাবুর সঙ্গে তাঁর চলাফেরা। নিজে নিঃসন্তান। তাঁর দুই ভাগ্নে হলধর গদাধর - তাঁর বাড়িতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা হয় যতিলালের বখাটে সঙ্গী। তবুও পুলিসে ধরার পূর্বপর্যন্ত বেচারাম যতিলাল সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করেননি।

যতিলালের বিয়ে মণিরামপুরের দাঙাঁবাজ মাধববাবুর কন্যার সঙ্গে স্থির হ'লে তিনি বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন। ঠকচাচার চক্রান্তেই যে এ সমস্ত সংঘটিত হচ্ছে তা বুঝতে পেরে তিনি বলেছেন : "বাবুরাম ! ভাল মন্ত্রী পাইয়াছ। এমন মন্ত্রীর কথা শুনলে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে - আর কিবা ছেলেই পেয়েছ। তাহার আবার বিয়ে।" [১৮] বেচারাম সৎ, ধর্মনিষ্ঠ হলেও আদর্শে পরাকাষ্ঠা নয়। তাই সে বাবুরাম-বাবুকে কথাও শুনিয়ে দিতে পারে। তাঁর এই স্বরূপটি যথার্থই জীবন্ত। তাছাড়া চরিত্রটির স্বাভাবিক স্ফুরণ ব্যাহত হয়েছে।

ঠকচাচা : ঠকচাচা খলনায়ক এবং ধূর্তচরিত্র। গ্রন্থটিতে এই চরিত্রটি সত্যিই জীবন্ত। সে মিথ্যে চক্রান্ত এবং জাল - জোচ্চুরির রাজা। মামলাবাজ। সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে তার মাতব্বরি এবং সবজান্তাভাব। প্রথমে সে বাবুরামবাবুর মন্ত্রীস্বরূপ। বাবু-রামবাবুর অবর্তমানে যতিলালও তার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এদিক দিয়ে দেখলে ঠকচাচাই 'আলালের ঘরের দুলালে'র কেন্দ্রীয় চরিত্র। "সকল চরিত্রের মধ্যে এই ভূমিকাটি সর্বাপেক্ষা স্ফুট এবং উজ্জ্বল। অপর ভূমিকাগুলি এমনকি যতিলালের ভূমিকাও, ঠকচাচার কাছে নিতান্ত

অনুজ্জ্বল।" [১১] কিন্তু মতিলালের জীবনকাহিনী রচনা করাই প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য হওয়ায় মতিলালই নায়ক। তবে লক্ষণীয়ভাবে আখ্যানের উত্থান পতন নিয়ন্ত্রণ করেছে ঠকচাচা।

ধূর্ত ঠকচাচা বুদ্ধির বলে রোজগার করে। তার কথা : "দুনিয়া সাচ্চা নয় - মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করব ?" [১০] এর মাধ্যমে তার সত্য পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ঠকচাচার এই জীবনদর্শণে স্পষ্টোচ্চারিত বাস্তববুদ্ধি পাঠককে অভিভূত করে। ঠকচাচা চরিত্রচিত্রণে এখানে প্যারীচাঁদের রসচেতনার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। ধূর্ত পটু ঠকচাচা সবসময়ই ভেবেছে কি ক'রে দুটো পয়সা রোজগার করা যায়। মতিলালকে সওদাগরী করার পরামর্শ দিয়ে নিজের অর্থলিপ্সাকে সে পূর্ণ করেছে। আর তা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জালিয়াতির দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে।

জালিয়াতির দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে ঠকচাচা সাধারণ লোকের মতো কাতর। তখন সে " বাঁধন খোলবার জন্য সাজনকে একটা আধুলি আস্তে আস্তে দিতেছে, সার্জনের বড় পেট, অমনি আধুলি ঠিক্‌রে ফেলিয়া দিতেছে। ঠকচাচা বলে, "মোকে একবার মতি-বাবুর নজদিগে নিয়ে চল - মুই কেল হাজির হব।" [১১] ঠকচাচার কাতর উক্তি পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

বেনিগারদে তার সময় আর কাটে না। সেচিত্রও জীবন্ত রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। জালিয়াতির শাস্তিস্বরূপ ঠকচাচার দ্বীপান্তর হয়েছে। দ্বীপান্তরে যাবার সময়ে ঠকচাচার দুঃখ পাঠকমনে লঘুহাস্যের সঙ্গে সমবেদনা জাগ্রত করে। ঠকচাচা তার দ্বীপান্তরের সঙ্গী বাহুল্যকে বলেছে —

> ঠকচাচা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলে, "মোদের নসিব বড় বুরা - মোরা একেবারে মেটি হলুয - ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে - মোকানবি গেল - বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না - মোর বড় ডর, তে না বি পেল্টে সাদি করে। [১২]

ঠকচাচার এই উক্তি তাকে অতি সাধারণ করে তুলেছে। তার এই দুঃখ খুবই স্বাভাবিক। তেমনি স্বাভাবিক তার ভাবনা। চরিত্রটি এখানে জীবন্ত রূপে ফুটে উঠেছে। তাই "ঠকচাচার চরিত্র কেবলমাত্র 'আলালের ঘরের দুলালে'র নহে, সে যুগের কথাসাহিত্যের একটি বিস্ময়কর জীবন্ত চরিত্র, ইহা চিত্র মাত্র নহে, ইহার মধ্যে জীবনের স্পন্দন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।" [২৩] ঠকচাচা দ্বীপান্তর যাত্রী। কিন্তু গৃহসুখের লালসায় কাতর। তার স্ত্রী হয়তো পুনরায় বিবাহ করবে - এর মাধ্যমে লেখক মানবজীবনের এক সুগভীর দুর্বলতাকে পরিস্ফুট করেছেন। দুষ্কার্য ও শঠতা তার চরিত্রে থাকলেও, সে রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ। চন্ডীমঙ্গলের ভাড়ুদত্তেরই মতো, সে বাংলা সাহিত্যে চির অম্লান।

বাবুরামবাবু : বাবুরামবাবু অসৎ উপায়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন। তিনি বিষয়ী লোক। স্নেহান্ধ পিতা। ছেলের বিদ্যার্জনের জন্য তার ভাবনার পাশে তাঁর অতুলনীয় কার্পণ্যও লক্ষ করা যায়। তদানীন্তন বাবু চরিত্র হিসেবে চরিত্রটি জীবন্ত। স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন থেকে জানা যায় তিনি স্ত্রীর বড় অনুরক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য —

> আপনার স্ত্রীকে বড় ভালবাসিতেন, স্ত্রী যাহা বলিতেন, সেই কথাই কথা - স্ত্রী যদি বলিতেন, এ জল নয় - দুধ, তবে চোখে দেখিলেও বলিতেন, তাই তো, ...। [২৪]

ঝড়ের মুখে পড়ে যখন নৌকো ডুবতে চলেছে তখনও তিনি স্ত্রীর মুখ মনে করেন। স্ত্রীকে কাছে কল্পনা করেই তিনি ঈশ্বরকে ডাকেন। মনোবল ফিরে পান। বাড়িতে পৌঁছাতে দেরি হবে জানিয়ে চিঠিও লিখেছেন স্ত্রীকে। তাদের বিবাহিত জীবনের কোনো অসুখী ছবি পাওয়া যায় না। অথচ কাহিনীর শেষাংশে তিনি পুনরায় বিয়ের জন্য ক্ষেপে উঠেছেন। নানা-ভাবে লাঞ্ছিত হয়েও শেষ পর্যন্ত বিবাহ করেছেন। এর ফলে তার পূর্ব মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক্ষুন্ন হয়েছে। বিয়েটা তার চরিত্রে স্বাভাবিকতার সূত্রে আসেনি মনে হয়।

এছাড়া আরও দুটি উল্লেখযোগ্য খলচরিত্র বাঞ্ছারাম ও বক্রেশ্বরের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঞ্ছারাম দুষ্টবুদ্ধি, স্বার্থান্বেষী, কপট আইনজীবী। ধনীর তোষামুদে,

স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন বত্রেশ্বরও পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। ঠকচাচার জালিয়াতির সঙ্গীবাহুল্যকে পাওয়া যায়। তা ছাড়াও যতিলালের সঙ্গীদের ক্রিয়াকলাপের বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। লক্ষণীয় বিকৃত স্বভাব, স্বার্থান্বেষী, চতুর মানুষদের চিত্র অঙ্কনে প্যারীচাঁদ অনেক বেশি সার্থক। এক মুহূর্তের জন্য আবির্ভাব ঘটলেও চরিত্রগুলি পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করে। ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'এ গৌণচরিত্র চিত্রণেও এই প্রবণতা আমরা লক্ষ করেছি। অবশ্য বলাই বাহুল্য ম্যালেন্সের অন্ধ ধর্মানুরক্তি প্যারীচাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁর মধ্যে ছিল একটা আদর্শবোধ। যে বোধ মানবিক চরিত্র বিকাশের সহায়ক। এই মানবিক আদর্শবোধের ফলে প্যারীচাঁদের সৃষ্টচরিত্রগুলি উপন্যাসোচিত বৈশিষ্ট্যে এক ধাপ এগিয়ে। চরিত্রগুলি অনেকটা স্বাভাবিকও হয়ে উঠেছে। তবে লক্ষণীয় স্ত্রীলোকদের জন্য প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকায়'[২৫] 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হলেও নারীচরিত্র চিত্রণে তিনি কোনো বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারেননি।

বাবুরামবাবুর স্ত্রী : লেখক তাকে সতী সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে প্রথমে অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসোচিত নারীব্যক্তিত্বের কোনো পরিচয় চরিত্রটিতে পাওয়া যায়না। প্রথমে দেখা গেছে বাবুরামবাবু তাঁর স্ত্রীর অনুরক্ত, স্ত্রী যা বলেন তাই করেন, প্রয়োজনে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শও করেন। কিন্তু মূলকাহিনীতে তার কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায় না। বাবুরামবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। কিন্তু তার স্ত্রীর নামও সেপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে বাবুরামবাবুর জীবনে স্ত্রীর কোন বিশেষ ভূমিকার পরিচয়ও পাওয়া যায়না। যতিলাল একটি ভদ্রকন্যার প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হ'লে তিনি সেখান থেকে কন্যাটিকে উদ্ধার করেছিলেন তাকে অভয় দিয়ে পিত্রালয়ে রেখে এসেছিলেন।

কিন্তু এর পরে তার আর কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাইনা। বাবুরাম-বাবুর মৃত্যুর পর তিনি যতিলালের হাতে প্রহৃতা হন। নিরুপায় হয়ে দুঃখে অপমানে তিনি কাশীবাসী হন। ভাগ্যের জোরেই তিনি পুনরায় সবাইকে ফিরে পান। কিন্তু এতে তার কোনো

ভূমিকা নেই। এবচেয়ে বড়ো কথা তার নারীসত্তার কোনোরূপ জাগরণ লক্ষ করা যায় না। চরিত্রটি একেবারে ম্লান ও নিষ্প্রভ। এদিক দিয়ে দেখলে নারীচরিত্র চিত্রণে ম্যলেন্স অনেক-বেশি সার্থক। ধর্মীয়চেতনা দ্বারা পরিচালিত হ'লেও তাদের একটা ভূমিকা লক্ষ করা যায়। দারিদ্র্য ক্লিষ্ট করুণা জীবনে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করেছে, স্বামী তাকে মেরেছে। কিন্তু করুণা সেজন্য মুখবুজে থানেনি। স্বামীকে সে কথা শুনিয়েছে। আবার তাকে চেষ্টা করে সৎপথে ফিরিয়েও এনেছে। কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্র সেদিকে আলোপসম্পাত করেননি। বাবুরাম বাবু যে স্ত্রীর অনুরক্ত তা লেখক বলেছেন, কিন্তু কার্যত তা দেখাননি। অথচ এ দিকটা তুলে ধরলে নারীচরিত্র চিত্রণে যেমন স্বাভাবিকতা ফুটে উঠতো, তেমনি উপন্যাসোচিত বৈশিষ্ট্যও তাঁর গ্রন্থে অধিকতর পরিস্ফুট হ'তো।

<u>ঠকচাচী</u> : মুহূর্তের জন্য এই চরিত্রটিকে দেখা গেলেও তার কথাবার্তা আমাদের মনে দাগ কাটে। ধূর্ত ঠকচাচাকেও সে রীতিমতো অভিযোগ করে - "তুমি হররোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও, তাতে মোর আর নেকড়াবালার কি ফয়দা ? তুমি হরঘড়ী বল যে, হাতে ... বহুত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায় ? ... তুমি দেয়ানার মত ফের - চুপচাপ মেরে হাবলি'তে বসেই রহ।" [২৬] ধূর্ত ঠক-চাচাকেও ঠকচাচী মুখঝামটা দিতে পারতো। সেজন্যই হয়তো দ্বীপান্তরে যাবার পথে ঠকচাচার মনে ঠকচাচী পুনরায় বিয়ে করতে পারে এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য মূলকাহিনীতে চরিত্রটির কোন ভূমিকা নেই।

তাছাড়া প্রমদা মোক্ষদার জীবনের যতোটুকু জানা গেছে তাতে কৌলীণ্যপ্রথা ও বহুবিবাহের ফলে নারীর ভাগ্যবিপর্যয়ের চিত্রই ধরা পড়েছে। মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রীর কোনো ভূমিকা কাহিনীতে নেই। তবে ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস কি ক'রে নারীকে সইতে হ'তো তার সাক্ষ্য তারা বহন করছে।'আলালের ঘরের দুলালের' নারীচরিত্রগুলি কাহিনীর পক্ষে অনেকটাই অবান্তর। [২৭] তারা সত্ত্বাহীন, নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্প্রভ। ফলে উপন্যাসোচিত চরিত্রের কোনো সম্ভাবনাও এখানে লক্ষ করা যায়না। তুলনায় ম্যলেন্সের নারীচরিত্রগুলো অনেক বেশি উজ্জ্বল।

'আলালের ঘরে দুলাল'এ লেখক লোকসাহিত্যের ধাঁচে বস্তুত অবিমিশ্রভালো ও অবিমিশ্র মন্দ চরিত্র অঙকন করেছেন। যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন - সমগ্র-জীবনের প্রতিক্রিয়া উপন্যাসের মুখ্যচরিত্রগুলিতে অনুভব করানো ঔপন্যাসিকের একটা কাজ। সে পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলে শিল্পেরও ত্রুটি ঘটে। 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভদ্রলোকচরিত্র-গুলিতে এই মৌল ত্রুটি বিদ্যমান।[২৮] এর ফলে আদর্শনিষ্ঠ ভদ্রচরিত্রগুলোর স্বাভাবিক স্ফুরণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু অবিমিশ্র মন্দচরিত্রগুলোতে তিনি প্রাণ সঞ্চারে সমর্থ হয়েছেন। আর নারীচরিত্রগুলো রয়ে গেছে নেপথ্যে। প্রাণের স্পন্দনে তাদের মধ্যে অনুভূত হয়না।

গ) <u>নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত</u>

প্যারীচাঁদ মিত্র 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও ব্রাহ্মসমাজাদর্শে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম যে তাঁর মানসে তাৎপর্যপূর্ণ সমাজসত্তা হয়ে উঠেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।" [২৯] প্রকৃতপক্ষে'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাবাদর্শ ব্রাহ্মধর্ম থেকেই গৃহীত।[৩০] কাহিনীতে লক্ষ করা যায় ভালোমানুষেরা সুখে শান্তিতে ভালো-ভাবে জীবন যাপন করেছে আর মন্দ মানুষেরা শাস্তি পেয়েছে। অনুতপ্ত ও পরিবর্তিত মন্দমানুষ মতিলাল ভালোমানুষ হয়ে ভালোভাবে জীবনযাপন আরম্ভ করেছে। এরকম সব ঘটনার মধ্যে নৈতিকতা প্রচারের একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকেই। গ্রন্থে লেখক এসব ঘটনার মাধ্যমে নানান হিতোক্তির ব্যবহার করেছেন। নীতিবাক্যযুক্ত ঔপদেশিক হিতোক্তি লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতাকে প্রতিপন্ন করে। 'আলালের ঘরের দুলালে' তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে দেখাতে চেয়েছেন সুষ্ঠুভাবে সন্তানপালন করতে না পারলে তার ফল হয় মারাত্মক ক্ষতিকর।

'আলালের ঘরের দুলালে'র মুখবন্ধে লেখক উল্লেখ করেছেন —

It (i.e.আলাল) Chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education, on self-formation and religious culture and partly of the state of things in the Moffussil.[৩১]

এর থেকে বোঝা যায় সন্তান পালন, শিক্ষাব্যবস্থা, আত্মগঠন, ধর্মীয় সংস্কৃতি, সেকালের বাঙালিজীবনের নানান দোষগুণের প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্যারীচাঁদ উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি কাহিনী রচনায় হাত দিয়েছেন সামাজিক বা আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে।[৩২]

'আলালের ঘরের দুলালে' লক্ষণীয় বৈষয়িক বুদ্ধিসর্বস্ব বাবুরামবাবু সৎশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বোধহীন এবং নিজের নৈতিকতার অভাব। এর ফলে বড় ছেলে মতিলাল কুসঙ্গে পড়ে নানা কুকর্মে রত হয়। শেষ পর্যন্ত জুয়াখেলার অপরাধে পুলিসে ধরা পড়ে। এর মূলে রয়েছে বাবুরামবাবুর অন্ধ স্নেহ বাৎসল্য এবং প্রশ্রয়। বস্তুত কুশিক্ষা, বদসঙ্গ, অভিভাবকের প্রশ্রয় ও অমনোযোগিতার ফলে ধনীর দুলাল মতিলালের বখে যাওয়া, মনের মতো কুসঙ্গীদের দলে পড়ে অপকর্ম করা, পরে বহু দুঃখের পর পুনরায় সজীবনে ফিরে আসা - এই হ'লো মূলকাহিনী। পঞ্চাশটিতে ছড়ানো কাহিনী কথকের মন্তব্যগুলি থেকে কাহিনীতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে এমন কতোগুলো মোটিফ বা উপাদানকে নির্দেশ করতে পারি ——

ক) ছাত্রদের বয়ঃক্রম অনুসারে মনের শক্তি ও ভাবসকল (সৎস্বভাব, সৎচরিত্র, সুবিবেচনা) সমানরূপে চালিত হওয়া কর্তব্য।

খ) এই শিক্ষার জন্য মা-বাবা ও শিক্ষকের যত্নের প্রয়োজন। ছেলেকে সৎ করতে হ'লে আগে বাবাকে সৎ হ'তে হবে।

গ) সঙ্গ দোষ সব থেকে ভয়ানক।

ঘ) লেখা পড়ার সঙ্গে খেলাধূলার প্রয়োজন।

ঙ) দুঃখ ভোগের মাধ্যমে নম্রতা আসে। নম্রতা না থাকলে নিজের দোষগুণের বিচার ও শোধন কখনই সম্ভব হয়না।

চ) পরমার্থচিন্তা বা ঈশ্বর ভক্তি থেকেই সহিষ্ণুতা, অভিমানশূন্যতা, দীনদরিদ্রের প্রতি করুণা ঈশ্বরের প্রিয়কর্মের প্রতি আসক্তি ও অপ্রিয়কর্মে বিতৃষ্ণা আসে। আত্মদোষ সন্ধান, পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য সকলের প্রতি স্নেহময়তা - ইত্যাদি সদগুণেরও বিকাশ ঘটে।

এই মোটিফগুলিই আখ্যানে পুনরাবৃত্ত হয়েছে বিভিন্নভাবে। এরই দৃষ্টান্ত-রূপে কখনো বিশেষ ঘটনা ও চরিত্রের আচরণকে পাই। কখনো বা চরিত্রের মানসিকতা ও আচরণের নির্দেশক মানদন্ডরূপেও তাদের সন্নিবিষ্ট হতে দেখি। বয়ঃক্রম অনুসারে মতি-লালের মনের ভাবসকল সমানরূপে পরিচালিত হয়নি। মা-বাবার অতি আদরে সন্তান উচ্ছন্নে যায়। সন্তানকে প্রকৃত মানুষ করতে হ'লে আদরের সঙ্গে শাসনও প্রয়োজন। বাবু-রাম বাবু এবিষয়ে অবহিত ছিলেন না। এর ফলে মতিলালের চিত্ত অধোগামী হয়েছে।

মতিলালের শিক্ষার জন্য বাবুরামবাবু শিক্ষক রেখেছেন। ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য পূজারী ব্রাহ্মণকে রেখেছেন। ফার্সী শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছেন মুন্সী-সাহেব। কিন্তু মতি-লাল কতোটা আগ্রহে সে শিক্ষা গ্রহণ করছে সেদিকে কখনো দৃষ্টি দেননি। বরং মতিলাল সম্পর্কে শিক্ষকেরা কোনো অভিযোগ জানালে উল্টো শিক্ষককেই অভিযুক্ত করতেন।

মুন্সী সাহেবের দুর্গতির পর বাবুরামবাবু ইংরেজি শিক্ষার অভিলাষে মতিলালের দায়িত্ব বেণীবাবুর হাতে অর্পণ করেন। অন্যের উপর দায়িত্ব দিয়ে আর যাই হোক সন্তান পালন হয়না। সন্তানকে মানুষ করতে হ'লে সব ব্যাপারেই পিতাকে সচেতন হ'তে হয়। এই সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে বেণীবাবুর জবানিতে —

> বাপকে সুচক্ষে সব দেখতে হয় - ছেলের সঙ্গে ছেলে হইয়া খাটতে হয়। অনেক কর্ম বরাতে চলে বটে, কিন্তু একর্ম পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয়না।[৩৩]

এটি উপদেশাত্মক হিতোক্তি। এর মাধ্যমে লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তবে এখানে লেখকের পরিবেশন নৈপুণ্য স্বীকার্য। উদ্দেশ্যমূলক হলেও তা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার তাৎপর্য এবং মাতা-পিতার দায়িত্ব কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে লেখক বলেছেন ——

> লেখাপড়া শিখিবার তাৎপর্য এই যে, সৎস্বভাব ও সৎচরিত্র হইবে - সুবিবেচনা জন্মিবে ও যে যে বিষয়কর্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে। এই অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্বপ্রকারে ভদ্র হয় ও ঘরে বাহিরে সকল কর্ম ভালরূপ বুঝিতেও পারে - করিতেও পারে। কিন্তু এমত শিক্ষা দিতে হইলে বাপ-মারও যত্ন চাই শিক্ষকেরও যত্ন চাই। বাপ যে পথে যাবেন ছেলেও সেই পথে যাবে। ছেলেকে সৎ করিতে হইলে আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত।[৩৪]

লেখক এখানে উপদেশের ঢংএ নৈতিকতা পরিবেশন করেছেন। মতিলালের অধঃপতনের কারণ বাড়িতে সে কোনো সুনীতি শেখেনি। এর ফলে কি কাজ ভালো হবে, এরূপ উচিত, অনুচিত বোধও তার জন্মেনি। তাই হলধর গদাধরকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে তার যা ইচ্ছে হয়েছে তাই করেছে। যেদিকে যেতে ইচ্ছে করেছে সেদিকেই গেছে। তাই লেখক বলেছেন ——

> শিশুদিগের প্রতি এমন নিয়ম করিতে হইবে যে, তাহারা খেলাও করিবে পড়াশোনাও করিবে। ক্রমাগত খেলা করা অথবা ক্রমাগত পড়াশোনা করা ভাল নহে। ... কিন্তু খেলারও হিসাব আছে, যে যে খেলায় শারীরিক পরিশ্রম হয়, সেই সেই খেলাই উপকারক।[৩৫]

তবে সবচেয়ে বড় কথা সঙ্গদোষ। বস্তুত "মতিলাল যে সকল সঙ্গী পাইল, তাহাতে তাহার সুস্বভাব দূরে থাকুক কুস্বভাব ও কুমতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল।" [৩৬] ফলে সঙ্গদোষ

অতি ভয়ানক। লেখক এখানে সুস্বভাব ও সুচরিত্র গঠনে কোন্ কোন্ দিকগুলো গ্রহণীয় এবং কোন্ কোন্ দিকগুলো বর্জনীয় - সেদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন। বলাবাহুল্য তা নৈতিকতাকেই প্রতিপাদন করে।

লেখক কখনো নিজের জবানিতে নৈতিকতা পরিবেশন করেছেন। আবার কখনো তার সৃষ্ট আদর্শচরিত্রগুলোর মাধ্যমেও তা পরিবেশন করেছেন। লেখক মতিলালের বৈপরীত্যে রামলাল চরিত্রটিকে অঙ্কন করে নৈতিকতা পরিবেশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য —

> যে ব্যক্তি বাল্যাকালাবধি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় ও কখন বিপদে না পড়িয়া কেবল সম্পদেই বাড়িতে থাকে, তাহার নম্রতা প্রায় হওয়া ভার - ... নম্রতা না থাকিলে আপনার দোষের বিচার ও শোধন কখনই হয়না। [৩৭]

বরদাবাবু ভক্তির পরাকাষ্ঠা। বাল্যকাল থেকে দুঃখে পড়ে তিনি পরমেশ্বরের ধ্যান করেছেন। এর থেকে তার মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে পরমেশ্বরের প্রিয়কর্মই করা কর্তব্য।

নৈতিকতাকে লেখক তাঁর আখ্যানের প্রয়োজনে পূর্বধার্যভাবেই ব্যবহার করেন। 'আলালের ঘরের দুলালে' নৈতিকতা পরিবেশনের মাধ্যমে লেখক তার রচনাটিকে উপভোগ্য করেছেন। কিন্তু ভালো চরিত্রগুলোতে বিশেষত বরদাবাবু চরিত্রটিতে এর বাড়াবাড়ি মনে হয়। এর ফলে চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। নৈতিকতা, ভক্তি ও সততার পরাকাষ্ঠা হিসেবে এমন চরিত্রের মূল্য যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন - উপন্যাসের বাস্তবতাকে তা স্পর্শ করতে পারেনা। বরদাবাবুর সংস্পর্শে থাকার ফলে রামলালের মধ্যে সততার প্রকাশ ঘটেছে। কেননা সদুপদেশ ও সৎসঙ্গে সুমতি জন্মে। তাই "মনের ভাবের চালনা সৎ-লোকের সহবাসে যেমন হয়, তেমন শিক্ষার দ্বারা হয়না ... সততা কখনই ঢাকা থাকে না।" [৩৮]

লক্ষণীয় যে মতিলালের কোনো হিতাহিত বোধ ছিল না। মা, বোন, ভাই, স্ত্রী - কারো প্রতি কোনো দায়িত্ব অনুভব করেনি, টান অনুভব করেনি। সেই মতিলাল

সদুপদেশ গ্রহণ করে, পরমেশ্বরের ধ্যান করে নিজেকে সংশোধিত করেছে। পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে মতিলালের পরিবর্তন আসে। মোটকথা —

> যে ব্যক্তি আপন পাপজন্য অন্তকরণের সহিত সন্তাপিত হইয়া আত্ম-শোধনার্থ প্রকৃতরূপে যত্নশীল হয়, তাহার কদাপি মার নাই।[৩৯]

মতিলাল চরিত্রের সংশোধনের মাধ্যমে লেখক এই সত্যটিকেই পরিস্ফুট করেছেন। আদর্শ জীবনে সুখ-শান্তি বিরাজমান। আর তার থেকে দূরে থাকার কষ্ট অপরিসীম। লেখক চরিত্র সৃষ্টিতে বৈপরীত্য ঘটিয়ে তা পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন।

'আলালের ঘরের দুলালে' লেখক যে মূল্যবোধের জগৎ গড়ে তুলতে চেয়েছেন বরদাবাবু ও রামলাল তার প্রতিনিধি। অংশত বেণীবাবু ও বেচারামবাবুও। বাবুরামবাবু ঠকচাচা, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারামের মানসিকতা ও আচরণ প্রদর্শনে তাদের নৈতিক বোধহীনতার নঞর্থক দিকটিকেও লেখক এখানে রূপায়িত করেছেন। এদের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন ঈশ্বরানুভূতি ও নীতিবোধহীন ধর্মকর্মের আড়ম্বরে তলিয়ে যেতে দিলে জীবনে শোচনীয় পরিণাম ঘনিয়ে আসে। বরদাপ্রসাদবাবুর মূল্যজ্ঞানের সঙ্গে বাবুরামবাবু ও তার সঙ্গীদের নৈতিকতাবর্জিত বৈষয়িকতা ও হিন্দুয়ানির বৈপরীত্যে ও দ্বন্দ্বে প্রথম থেকেই তা স্পষ্ট করে তুলেছেন।

বরদাবাবু আধুনিক ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে তাঁর সুখ শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজমান। তাঁর বৈপরীত্যে বাবুরামবাবুর দুই কন্যা প্রাচীনপন্থী বিষয়ী হিন্দু পরিবারের কৌলীণ্য প্রথার নিষ্পেষণে অভিশপ্ত, লাঞ্ছিত জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। সমস্ত দিক থেকে বাবুরামবাবুর নৈতিকবোধহীনতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই লেখক বৃদ্ধ বয়সে বাবুরামবাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন। তাই "পরমেশ্বরের প্রতিভক্তি, নীতিজ্ঞান ও সদ্বুদ্ধি যাহাতে বাড়ে তাহাই করা কর্তব্য।"[৪০] এসব লক্ষ করলে মনে হয় নৈতিকতার উচ্চকিত পরিবেশন লেখকের উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বলা

বাহুল্য এই নৈতিক প্রকাশ ভঙ্গির জন্য ভালোচরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে প্রাণহীন - যা গ্রন্থটির উপন্যাস ধর্মকে ক্ষুন্নই করেছে।

বস্তুত উপন্যাসে অধিকার আছে জীবনের, অধিকার আছে সত্যের, এবং শিল্পের। আলাদা করে নীতির বা ধর্মের কোনো অধিকার নেই। "উপন্যাস যখন জীবন-সম্মত না হয়ে, শিল্পগত উদ্দেশ্যে চালিত না হয়ে নীতিগত উদ্দেশ্যে চালিত হয়, তখন অবশ্যই আর্টের কাছে অপরাধ ঘটে।" [৪১] লেখক এখানে নিজের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্ররোচনায় নিজের বিশেষ সংস্কার বা নীতিবোধের টানে জীবনের 'লজিক'কে লঙ্ঘন করতে চেয়েছেন। লেখকের দৃষ্টি এখানে নির্মোহ নয়। যে নির্ভেজাল সত্যতা উপন্যাসে কাম্য, এখানে সে সম্পর্কে সংশয় জাগে। জীবনের অকৃত্রিম নগ্ন নির্মম প্রকাশ থেকে মনে হয় এখানে আমরা বঞ্চিত হ'লাম।

ঘ) ভাষাবিন্যাস : লৌকিকপ্রবাদ, গান ও ছড়ার ব্যবহার

জীবনের বিচিত্র ঘটনা, অবস্থা ও মানসিকতাকে রূপায়িত করা হয় উপন্যাসে। স্বভাবতই বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুসারে তার উপযোগী ভাষা রচনাও ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব। ভাষার মাধ্যমেই লেখক তাঁর জীবনদৃষ্টিকে ধরে রাখেন। আসলে জীবনদৃষ্টির পার্থক্যে, বিষয়ের বিভিন্নতায় এবং লেখকের বক্তব্যের বৈচিত্র্যে ভাষাও নানান রূপ ধরে। [৪২] 'আলালের ঘরের দুলাল'এ আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার আলোকে উচ্চতর আদর্শ জীবন গঠনকে লেখক স্বাগত জানিয়েছেন, বাংলা গদ্যে চলিত ভাষার ব্যবহার 'আলালের ঘরের দুলালে'র মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য —

> ... আলালের ঘরের দুলাল, বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনয়ন করিল। এই পুস্তকের ভাষার নাম 'আলালীভাষা' হইল। তখন আমরা কোনও লোকের ভাষাকে গাম্ভীর্যহীন দেখিলেই তাহাকে আলালী ভাষা বলিতাম। ... এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। [৪৩]

আলালী ভাষায় ক্রিয়াপদগুলো সাধুভাষার। বাক্যগুলোতে সংস্কৃত শব্দের বদলে চলতি শব্দের এবং চলতি গৎএর (ইডিয়ম) সন্নিবেশের জন্যই আলালী ভাষা প্রচলিত ভাষা। লোকশিক্ষার জন্য প্যারীচাঁদমিত্র অনেক সাময়িক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে পাকাপাকি ভাবে অবতরণের পূর্বেই তিনি বাংলা গদ্যে নিবন্ধাদি রচনা করে বাংলা রচনার আড়ষ্টভাব অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যাপারে সর্বাগ্রে মাসিক পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। পত্রিকার প্রতি সংখ্যার প্রারম্ভে মন্তব্য ছাপা থাকতো —

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞপন্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" [৪৪] এই মাসিক পত্রিকায় তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্যারীচাঁদের পূর্ববর্তী সাহিত্য ছিল প্রবন্ধকেন্দ্রিক। আর সেজন্যই সেই গদ্য মৌখিক বাক্য প্রভৃতির কাছাকাছি যায়নি। কিন্তু নারীসমাজের কথা ভেবে দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহারের অনুসরণে তিনি 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষার আদল গড়ে তুলেছেন। লক্ষণীয় আলালের ঘরের দুলালে'র গদ্যের ভিত্তি সাধুভাষা। কিন্তু শব্দ নির্বাচন করেছেন সহজ ও সর্বজনবোধ্য। তাছাড়া প্রবাদবাক্যের উপযুক্ত প্রয়োগে তাঁর সৃষ্ট ভাষা হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। প্যারীচাঁদ আসলে সমকালীন প্রাবন্ধিক গদ্য ও সমকালীন কথ্যভাষার সমন্বয় ঘটিয়ে বিশিষ্ট গদ্য-রীতির সৃষ্টি করেছেন।

আসলে সেকালের অল্পশিক্ষিত সাধারণ নরনারীর পক্ষে বোধগম্যতার কথা ভেবেই তিনি চেয়েছিলেন বাংলা সাধুগদ্যের সরলীকরণ। প্যারীচাঁদ তাই 'আলালের ঘরের দুলালে'র গদ্যে সাধুভাষার কাঠামোর উপরে মৌখিক ভাষা ব্যবহারের দ্বারা চলিত ভাষার শক্তি পরীক্ষা করেছেন। তবে 'আলালের ঘরের দুলাল' পুরোপুরি চলিত ভাষায় রচিত হয়নি। সাধুভাষার ক্রিয়াযুক্ত বাক্যে চলিত ভাষানুসারী বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহার করেছেন।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বনাম, অব্যয়পদও ব্যবহার করেছেন। এককথায় বলতে গেলে 'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষা হ'লো মিশ্র সাধুভাষা। তবে যেখানে উপদেশ দিয়েছেন সেখানে রচনাভঙ্গি প্রায়ই বিশুদ্ধ সাধুভাষার।[৪৫] প্রকৃতপক্ষে 'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষার জন্য তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন।

চলতি জীবনের বাতাবরণ সৃষ্টিই প্যারীচাঁদের ভাষা ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য। কথোপকথন অংশে খাঁটি মুখের ভাষা ব্যবহৃত হ'লেও, বর্ণনাংশে সাধুভাষা ও পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদের ব্যবহার লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ যোগ্য —

> কতকগুলিন স্ত্রীলোক জল আনিতে আসিয়াছিল, কর্ত্তাকে দেখিয়া তাহারা একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে২ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো - 'আ মরি! কি চমৎকার বর! যার কপালে ইনি পড়বেন সে একেবারে এঁকে চাপাফুল করে খোঁপাতে রাখবে।' তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল - 'বুড়ো হউক ছুড় হউক তবু একে মেয়েমানুষটা চক্ষে দেখতে পাবে তো ? সেও তো অনেক ভালো।[৪৫]

কথ্যভাষা নির্ভর জীবনানুসারী ভাষা ব্যবহারের প্রয়াস তার গদ্যভঙ্গিতে প্রকাশ পেল। বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ, ধন্যাত্মকশব্দ ও প্রবচনের ব্যবহার তাঁর রচনায় লক্ষণীয়। তাছাড়া প্রচুর দেশজ শব্দ ও প্রয়োজনীয় ফারসী শব্দের ব্যবহারে আলালীভাষা জীবন্ত ও জীবনানুসারী হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় —

> শুনিয়াছিলাম যে, দানসামগ্রী অনেক দিবে-দালানে উঠিয়া দেখিলাম, সে গুড়ে বালি পড়িয়াছে। আশা ভগ্ন হওয়াতে ঠকচাচা এদিক্ ওদিক্ চান - গুমরে গুমরে বেড়ান - মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি ও একএকবার ভাবি, এস্থলে সাটে হেঁহেঁ দেওয়া ভাল। বর-স্ত্রী-আচার করতে গেল, ছোট বড় অনেক মেয়ে ঝুনুর ঝুনুর করিয়া চারিদিকে আসিয়া বর দেখিয়া

> আঁতকে পড়িল, যখন চারি চক্ষে চাওয়াচায়ি হয়, তখন কর্ত্তাকে চশমা নাকে দিতে হইয়াছিল - মেয়েগুলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া ঠাট্টা জুড়ে দিল - ... কথাই আছে, লোভে পাপ-পাপে মৃত্যু।[৪৭]

এই উদ্ধৃতির গুড়েবালি, গুমরে গুমড়ে, মুচকে মুচকে, হেঁহেঁ, ঝুনুর ঝুনুর, আঁতকে, চারিচক্ষে চাওয়াচায়ি, খিলখিল, লোভে পাপ - পাপে মৃত্যু - প্রভৃতি শব্দগুলো বাংলা ভাষায় প্রাণের সম্পদ। উদ্ধৃত অংশটি লেখকের বিবরণ নয়, গ্রামের বুড়ো মজুমদারের সংলাপ। সংলাপে এমন মার্জিত-অমার্জিত চলিত ভাষার ব্যবহার বিষয়কে জীবন্ত করে তুলেছে। তবে শুধু সংলাপের ক্ষেত্রেই নয়, সাধারণ ঘটনা ও পরিবেশের বিবরণ দানের ক্ষেত্রেও চলিত ভাষা ব্যবহার করে সচলতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় —

> বাদাতে ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে, সালতি সাঁসাঁ করিয়া চলিয়াছে - চারিদিকে জলময় - মধ্যে মধ্যে চৌকি দিবার টং; কিন্তু প্রজার নিস্তার নাই, এদিকে মহাজন, ওদিকে জমিদারের পাইক; যদি বিকি ভাল হয়, তবে তাহাদিগের দুইবেলা দুই মুঠা আহার চলিতে পারে, নতুবা মাছটা, শাকটা ও জনখাটা ভর্সা।[৪৮]

ভাষাব্যবহারের কৌশলের দ্বারা লেখক 'আলালের ঘরের দুলালে'র গদ্যকে রসাশ্রিত করেছেন। আবার গতিবেগ সৃষ্টির জন্য বাক্যগঠনের কলাকৌশলের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন। এই গতিবেগ এসেছে ক্রিয়াপদহীন এবং ক্রিয়াপদযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগঠনের মাধ্যমে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় —

১। চাঁদনীর রাত্রি। গঙ্গার উপর চন্দ্রের আভা পড়িয়াছে - মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে - বনফুলের সৌগন্ধ মিশ্রিত হইয়া একএকবার যেন আমোদ করিতেছে - ঢেউগুলা নেচে নেচে উঠিতেছে।[৪৯]

২। ... নদী বেগবতী বারি তর্‌তর্‌ শব্দে চলিয়াছে - আপনার নির্ম্মলত্ব হেতু বৈকালিক বিচিত্র আকাশকে যেন ক্রোড়ে লইয়া যাইতেছে।[৫০]

'আলালের ঘরের দুলালে' এরকম নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। লঘু-ব্যঙ্গের ইঙ্গিতে তাঁর লেখা স্বচ্ছন্দ। বিদ্রূপে হাস্যে মজা করার ইয়ার্কিতে এ ভাষা সিদ্ধ। বাংলার দেশীয় সমাজসংস্কৃতি ও ভাষারীতির সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। কখনো কাহিনী কথনে, কখনো বা চরিত্রগুলির উক্তিতে প্রবাদ প্রবচন এবং বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গির ব্যবহারের মাধ্যমে তার এই পরিচয় নিহিত রয়েছে।

তার ব্যবহৃত কতগুলো প্রবাদ প্রবচন বহুল প্রচলিত। প্রবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ রচনা। প্রবাদ জীবনসত্যকে প্রকাশ করে। ভাষাকে জোরালো বক্তব্যধর্মী ও সজীবতর করে তোলে। সংক্ষিপ্ততা, অর্থবহতা, সরসতা - প্রবাদের বৈশিষ্ট্য। 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রকৃত প্রবাদ ছাড়াও বহুপ্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এছাড়াও প্রবাদকে অনেক সময় বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা 'ইডিয়ম' রূপেও দেখা হয়। কিন্তু সেগুলোও আসলে ইডিয়ম নয়। তাঁর গ্রন্থে এধরণের শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করি। বিভিন্ন প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক শব্দপ্রয়োগের একটা তালিকা নীচে দিচ্ছি[৫১]

১। অনলে জল পড়িল (পৃ.১৬৩)
২। অনাথার দৈব (পৃ.১৯০)
৩। অরণ্যে রোদন করা (পৃ.১৯৪)
৪। সবে ধন নীলমণি (পৃ.১৩১)
৫। সিংহের সন্তান কি কখন শৃগাল হইতে পারে ? (পৃ.১৩১)
৬। নিত্য কাঁচা কড়ি (পৃ.১৩১)
৭। ফণজন্মা (পৃ.১৩২)
৮। দিক্‌পাল (পৃ.১৩২)
৯। হাতের নোয়া খুলিতে হইবে (পৃ.১৩২)

১০। খুখকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা(পৃ·১৩৩)
১১। পরের মুখে ঝাল খাওয়া (পৃ·১৩৫)
১২। গোকুলের ষাড় (পৃ·১৪১)
১৩। উনপাজুরে - বরাখুরে(পৃ·১৪১)
১৪। পক্ষিরাজের বংশ (পৃ·১৫৩)
১৫। দুধ দিয়া কালসাপ পুষিয়াছিলে(১৪৭)
১৬। ছেলে নয় পরেশ পাথর (পৃ·১৪৮)
১৭। ছেলের হাতে পিটে ? (পৃ·১৪৮)
১৮। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণেক হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ্ (পৃ·১৫২)
১৯। পুঁটি মাছের মত ফরফর করিয়া বেড়ায় (পৃ·১৫৪)
২০। কড়িতে হয় বুড়ার বিয়ে (পৃ·১৫৮)
২১। সময় জলের মত যায় (পৃ·১৫৬)
২২। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা (পৃ·১৬০)
২৩। শাঁকের করাত (পৃ·১৬১)
২৪। এক বর্ষণে কি চিরকালের তৃষ্ণা যাবে ? (পৃ·১৬১)
২৫। গলায় দড়ে জাত প্রায় বড় ধূর্ত (পৃ·১৬২)
২৬। বেল পাকলে কাকের কি ? (পৃ·১৬২)
২৭। মণিহারা ফণী (পৃ·১৬৪)
২৮। শিবরাত্রির শলিতা (পৃ·১৬৬)
২৯। সাক্ষাৎ সরস্বতী মূর্তিমান (পৃ·১৭৫)
৩০। বুদ্ধির ঢেঁকি (পৃ·১৮১)
৩১। নানা মুনির নানা মত (পৃ·১৮৩)

৩২। এককলসী দুধে একফোঁটা গোবর (পৃ·১৮৩)

৩৩। চারিদিকে সরিষাফুল (পৃ·১৮৩)

৩৪। শিবের অসাধ্য(পৃ·১৮৪)

৩৫। গলাধাক্কা (পৃ·১৮৮৫)

৩৬। কেতাবি বুদ্ধি (১৮৬)

৩৭। বিপৎকালে চক্ষুল হওয়া নির্বুদ্ধির কর্ম্ম (পৃ·১৮৭)

৩৮। লোভে পাপ - পাপে মৃত্যু (পৃ·১৯৬)

এরূপ প্রচুর প্রবাদ ও বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রয়োগ 'আলালের ঘরের দুলালে' লক্ষ করা যায়।[৫২] তবে শুধু প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহারই নয়। লৌকিক ছড়া ও গানের ব্যবহারের মাধ্যমেও তিনি তাঁর ভাষাকে নূতনত্ব দিয়েছেন। যতিলালের বিয়েতে বিবাহবাসরে গণ্ডগোল হয়। তাকে কেন্দ্র করে বিদ্যাভূষণের কবিতা এখানে উল্লেখযোগ্য —

খোপ খোপে গাদাযালা রাঙা কাপড় রূপার বালা
এতক্ষণে বিয়ের শালা সাজে।

... ...

নেঠিয়াল রাজপুত দরয়ান রাজপুত
নিনাদ অদ্ভুত সাজে।[৫৩]

যতিলাল ও তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে রচিত একটি কবিতা —

হলধর গদাধর উস্‌খুস্‌ করে।
ছটফট্‌ ছটফট্‌ ক'রে তারা মরে।
ঠকচাচা হন কাঁচা শুনে বাজে কথা।
হলধর গদাধর খাইতেছে মাথা।
পড়াপড় পড়াপড় ফাড়িবার শব্দ।
গুপাগুপ্‌ গুপাগুপ্‌ কিলে করে জব্দ।
ঠনাঠন্‌ ঠনাঠন্‌ ঝাড়ে ঝাড়ে লাগে।
সট সট্‌ সট্‌ সট্‌ ক'রে সবে ভাগে।

মতিলাল দেখে কাল ব'সে ব'সে দোলে।
সুতোর কি আমার আছয়ে কপালে।[৫৪]

ধ্বন্যাত্মক শব্দের এরূপ ছন্দবদ্ধ ব্যবহার ভারতচন্দ্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। মতিলাল এবং তার দলবলকে মজুমদার যে ছড়াটি শুনিয়েছে সেটিও বড় উপভোগ্য ——

ঠকচাচা মহাশয় সদা করি মহাশয়,
বাবুরামে দেন কানে মন্ত্র।
বাবুরাম অঘা অতি, হইয়াছে ভীমরথী,
ঠকবাক্য শ্রুতি-স্মৃতি তন্ত্র॥[৫৫]

অঘা, ভীমরথী - ইত্যাদি কথ্যরীতির শব্দ প্রয়োগে ছন্দকেও তিনি গতি দিয়েছেন। ভাষাও হয়ে উঠেছে জীবন্ত। মতিলালের বিবাহে কবিকঙ্কনদাদার পদ্য, বাবুরামবাবুর দ্বিতীয় বিবাহে মজুমদারের পদ্য থেকে ঘটনার বিবরণ জানা যায়। গদ্যে লেখা আখ্যানে পদ্যের এই ব্যবহার লোকসাহিত্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এসব পদ্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব স্পষ্ট। কবিকঙ্কন উপাধিটিও মঙ্গলকাব্যের। তবে লেখক এখানে নিজ সৃষ্টির প্রয়োজনে লোকসাহিত্যের এই সমস্ত উপকরণকে ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তিগত প্রতিভাবলে তিনি ঐতিহ্যগত লৌকিক-সাহিত্যের নানান দিক, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের পরিকল্পনায়, ভাষার গঠনে, কখনো বা বিশেষ আবহাওয়া ও আদর্শের নির্মানে ব্যবহার করেছেন। এর ফলে তাঁর গদ্যভাষায় গতি-বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সেজন্যই 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষারীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমালোচক, লেখক ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সবচেয়ে বেশি।

চলতি ভাষার আদলে তিনি লঘু ভঙ্গির সৃষ্টি করেছিলেন। সেকালের ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে তা ছিল এক অভিনব ঘটনা। বস্তুত একটি সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে সমা-লোচনা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী সাহিত্যের ওপর তার প্রভাব বা সাহিত্যের নূতন ঐতিহ্য প্রবর্তনের ধারায় তার ক্ষমতা। 'আলালের ঘরের দুলালে'র দেশজ ভাষারীতি ও সমাজ পর্যবেক্ষণ যে সাহিত্যিক পরিবেশ তৈরি করেছিল, মধুসূদনের দুটি প্রহসন, দীনবন্ধুর নাটক প্রহসন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।[৫৬] তাছাড়া সামাজিক ব্যঙ্গ কৌতুক পূর্ণ নক্শার ধারাতেও তাঁর প্রভাব লক্ষণীয়। 'আলালের ঘরের দুলালে'র অনুপ্রেরণায় 'হুতোম প্যাঁচার

নক্‌শা' রচিত হয়েছিল। তাছাড়া ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৫), ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাক ভূষণ্ডীর কাহিনী'(১৮৬৫), নিশাচর বা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ কুচিত্র'(১৮৬৫) প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।[৫৭] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লোকরহস্যের বিদ্রূপাত্মক ও কৌতুকরসসিক্ত সংলাপ ভিত্তিক সমাজচিত্র বা নক্‌শায় প্যারীচাঁদের ব্যবহৃত দেশজধারাকে অনুসরণ করেছিলেন।[৫৮]

কিন্তু পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিকদের ওপর 'আলালের ঘরের দুলালে'র বিশেষ কোন প্রভাব লক্ষ করা যায় না। এর কারণ অনুসন্ধান করে সমালোচক বলেছেন

> 'আলালের ঘরের দুলাল'এর ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর উপন্যাসের ভাষা গ্রহণের একটি ত্রুটি রেখে গিয়েছিলেন। ... আরবী ও ফারসী ভাষা ছিল ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর সাহিত্যের ভাষা। ঐ সময়ে মুসলমান নবাবদের সাহিত্যের ভাষা ছিল 'আরবী ও ফারসী; ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্যারীচাঁদ মিত্র ঐ মৃতপ্রায় ভাষাকে তাঁর উপন্যাসের ভাষা হিসেবে করলেন।[৫৯]

প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের উপর ইংরেজি প্রভাব পড়েছিল। আরবী ফারসী তখন অস্তমিত ভাষা। এই অস্তমিত ভাষার শব্দব্যবহারের ফলে পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের উপর প্যারীচাঁদের সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষ করা যায়না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা উপন্যাসের ভাষার প্রসার ঘটে। কিন্তু তার পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নের প্রভাব কম। পরবর্তীকালে ইংরেজি সহিত্যের অনুকরণে বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্নের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল'এ যতিচিহ্নের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে প্রাচীনকালের ধাঁচেই বেশি। এর ফলে প্যারীচাঁদের ভাষার প্রভাব পরবর্তী লেখকদের উপর খুবই কম পড়ে। আর হয়তো এই কারণেই তিনি গৌণ লেখকদের পর্যায়ে পড়েন।[৬০]

তাছাড়া 'আলালের ঘরের দুলালে'র কোনো কোনো অংশের সংলাপের গদ্যরীতির নিষ্প্রাণতা আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। প্রসঙ্গত কাশীতে মায়ের প্রতি যতিলালের

উক্তি উল্লেখযোগ্য —

> মা! আমি যেমন কুপুত্র, কুভ্রাতা, তেমনি কুস্বামী - এমন সৎ স্ত্রীর যোগ্য আমি কোন প্রকারেই নহি। স্ত্রীপুরুষ বিবাহকালীন পরমেশ্বরের নিকট একপ্রকার শপথ করে যে, তাহারা যাবজ্জীবন পরস্পর প্রেম করিবে, মহাক্লেশে পড়িলেও ছাড়াছাড়ি হইবে না - স্ত্রীর অন্য পুরুষের প্রতি মন কখন হইবে না এবং পুরুষেরও অন্য স্ত্রীর প্রতি কদাচ যাইবে না - এইরূপ মননে ঘোর পাপ। এই শপথের বিপরীত কর্ম আমা হইতে অনেক হইয়াছে, তবে স্ত্রী কর্তৃক আমি পরিত্যক্ত কেন না হই ?[৬১]

এই উক্তিতে ব্যক্তি হৃদয়ের আবেগের ক্ষীনতম স্পর্শও মেলে না। গ্রন্থে এরূপ সংলাপের উদাহরণ বেশ মেলে। তবুও ভাষা ব্যবহারে প্যারীচাঁদের এই দুর্বলতা ম্যালেন্সের তুলনায় যথেষ্ট কম। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে' আমরা লক্ষ করেছি চরিত্রগুলির সংলাপে প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়না। ধর্মপুস্তকের নানা উপদেশ চরিত্রগুলির মুখে উচ্চারিত হওয়ায় সংলাপের স্বাভাবিকতা ক্ষুন্ন হয়েছে। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে' ধর্মীয় বাণী প্রচারের প্রচেষ্টা না থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই তা হয়ে উঠেছে আড়ষ্টতা মুক্ত। ফলে ভাষা ব্যবহারে প্যারীচাঁদ ম্যালেন্সের তুলনায় অনেক বেশি সার্থক। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের ভাষাকে যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতেই বিচার করেছেন। আবার তার অসম্পূর্ণতাকেও নির্দেশ করেছেন। 'বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্যারীচাঁদমিত্র প্রবন্ধে প্যারীচাঁদের চলিত ভাষা ব্যবহারের ঐতিহাসিক ভূমিকা তিনি যথার্থভাবেই নির্দেশ করেছেন —

> আমি এমন বলিতেছি না যে "আলালের ঘরের দুলালে"র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাবসকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্বজনহৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার

> তাহা সহজ গুণ। ... প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাহার অক্ষয়কীর্তি।[৬২]

'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা যে উপন্যাসের ভাবাদর্শ হ'তে পারেনা বঙ্কিম চন্দ্র তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নিজেই সাহিত্যের ভাষার আদর্শ গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে যেমন বিদ্যাসাগর মূলকাঠামোর সৃষ্টিকর্তা, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ভাষার কাঠামোটি গড়ে তুললেন। আর, রবীন্দ্রনাথে এসেই বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষা সুনির্ভর হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমের হাতে গড়ে উঠেছে কথাসাহিত্যের ভাষার সাধুরীতির রূপ। আর, রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়ে উঠেছে চলিত-রীতির রূপ। পরবর্তীকালে এই দুটি পথেই বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষা অগ্রসর হয়েছে।

৬) বাস্তবতা প্রসঙ্গ

বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিফলন উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'আলালের ঘরের দুলাল'এ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের কলকাতা ও তার নিকটবর্তী মফঃস্বল অঞ্চলের হিন্দুসমাজের বাস্তবরূপ চিত্রিত হয়েছে। তবে আলালের ঘরের দুলাল'এর সমাজবীক্ষণের অংশ ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাবুরামবাবুর মতো আলালরা নানাভাবে অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে বাবুগিরিতে গা ভাসিয়েছে। নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের কোনো স্থান ছিলনা এই 'সপার্ষদ বাবুলীলায়। এইসব আলালের ঘরে বেড়ে উঠতো মতিলালের মতো দুলালেরা। বাবা বাবুগিরিতে মত্ত। ছেলে অসভ্য, অশিক্ষিত, অমানুষ। এরা না শিখতো লেখাপড়া, না ছিল জমিদারি চালানোর মতো বিষয়বুদ্ধি। বাবুগিরি বজায় রাখতে গিয়ে ইয়ার-বক্শিদের বুদ্ধিতে সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যেতো। প্যারীচাঁদ মতিলালের মাধ্যমে এদের জীবনটাই ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে।

প্যারীচাঁদ তাঁর বাস্তবজীবন পর্যবেক্ষণকে কৌতুকরসের মিশ্রণে উপভোগ্য করে তুলেছেন। তিনি প্রথমেই কথনের প্রত্যক্ষ ভঙ্গিতে বৈষয়িক বাবুরামবাবুর ধনী হওয়ার ইতিহাস বিবৃত করেছেন —

> বৈদ্যবাটীর বাবুরামবাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন। তিনি মাল ও ফৌজদারী আদালতে অনেক কর্ম করিয়া বিখ্যাত হন। কাজকর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উৎকোচাদি গ্রহণ না করিয়া যথার্থ পথে চলা বড় প্রাচীন প্রথা ছিলনা, বাবুরামবাবু সেই প্রথানুসারেই চলিতেন। একে কর্ম্মেপটু, তাতে তোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি দ্বারা সাহেবসুবাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এজন্য অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন করিলেন।[৬৩]

এখানে বিখ্যাত শব্দটি বিদ্রূপাত্মকরূপে ব্যবহৃত। বাবুরামের খ্যাতির কারণ শুধু কর্মপটুতা নয়, অসাধু উপায়ে বিপুল অর্থোপার্জনও। আদালতের কাজকর্মে অবৈধভাবে অর্থোপার্জন যে ইংরেজ প্রভুদের প্রশ্রয়ের ফলেই সম্ভব হয়েছিল, তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও উদ্ধৃত অংশের শেষ বাক্যটিতে মেলে। বাবুরামবাবুর মতো অসাধু উপায়ে অর্জিত বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিকরা ছিলেন বৈষয়িক বুদ্ধি সর্বস্ব এবং ধর্মকর্মের আড়ম্বরময় অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। ব্রাহ্মণ পুরোহিত, শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন তাঁদের পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত।

'আলালের ঘরের দুলালে' বাবুরামের জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গরূপে ধনীর প্রসাদলোভী ব্রাহ্মণ পুরোহিত-পণ্ডিতদের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রকে বারবার উপস্থাপিত হতে দেখি। বাবুরামবাবু মতিলালকে ব্যাকরণ পড়ানোর প্রয়োজন স্থির করে পূজারী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেছেন —

> তোমার ব্যাকরণ ট্যাকরণ পড়াশুনা আছে ? পূজারী ব্রাহ্মণ গণ্ডমূর্খ - মনে করিল, যে চাউল কলা পাই, তাতে তো কিছুই আঁটে না - এত দিনের পর বুঝি কিছু প্রাপ্তির পন্থা হইল। এই ভাবিয়া প্রত্যুত্তর করিল, 'আজ্ঞে হাঁ'।

প্রসাদলোভী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বাস্তবচিত্রটি লেখক এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রচলিত সংস্কার, প্রথা, অনুষ্ঠানের অনুরাগী বাবুরামবাবু কৌলীন্যের সমর্থক ছিলেন। তারও বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক —

> বাবুরামবাবু বলরাম ঠাকুরের সন্তান, এজন্য জাতি রক্ষার্থে কন্যাদ্বয় জন্মিবামাত্র বিস্তর ব্যয় ভূষণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতারা কুলীন, অনেকস্থানে দারপরিগ্রহ করিয়াছিল — বিশেষ পারিতোষিক না পাইলে বৈদ্য-বাটীতে উঁকি মারিত না।[৬৪]

কুলকৌলীন্য রক্ষার ফলে বড় মেয়ে মোক্ষদা বিধবা। ছোট মেয়ে প্রমদা কুলীনের স্ত্রী। তাদের দুবোনের কথোপকথন থেকে কুলীন স্ত্রীর বিড়ম্বিত জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। প্রমদার জবানিতে শুনি —

> ... আর বৎসর যখন আমি পালাজ্বরে ভুগতেছিনু দিবারাত্রি বিছানায় পড়ে থাকতুম - উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না, সে সময় স্বামী আসিয়া উপস্থিত হলেন। স্বামী কেমন, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখি নাই, মেয়ে মানুষের স্বামীর ন্যায় ধন নাই। মনে করিলাম, দুইদণ্ড কাছে বসে কথা কহিলে রোগের যন্ত্রণা কম হবে। দিদি বললে প্রত্যয় যাবেনা, তিনি আমার কাছে দাঁড়াইয়াই অমনি বললেন, "ষোল বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ ক'রে গিয়াছি। তুমি আমার এক স্ত্রী, টাকার দরকারে তোমার নিকটে আসিতেছি, শীঘ্র যাব, তোমার বাপকে বললাম। তিনি তো ফাঁকি দিলেন, তোমার হাতের গহনা খুলিয়া দাও।" আমি বললাম, 'যাকে জিজ্ঞাসা করি, যা যা বলবেন, তাই করবো।' এই কথা - শুনবামাত্র আমার হাতের বালাগাছা জোর করে খুলে নিলেন। আমি একটু হাত বাগড়া বাগড়ি করেছিনু, আমাকে একটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, তাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিনু, তারপর মা আসিয়া আমাকে অনেকক্ষণ বাতাস করাতে আমার চেতনা হয়।[৬৫]

প্রাচীনপন্থী বিষয়ী হিন্দুর পরিবারের নারীর জীবন কৌলীন্য প্রথার নিষ্পেষণে যে কি দুর্বিষহ হয়ে উঠে ছিল লেখক এখানে সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন। ঐতিহাসিকের বস্তুনিষ্ঠায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের ইংরেজি শিক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন —

> প্রথম যখন ইংরাজরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে শেঠ বসাক বাবুরা সওদাগরী করিতেন, কিন্তু কলিকাতার একজনও ইংরাজী ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্তা, ইশারা দ্বারা হইত। মানবস্বভাব এই যে, চড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু ইংরাজী কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের ধাক্কায় ইংরাজীর চর্চা বাড়িয়া উঠিল। ... বিবাহে অথবা ভোজের সভায় যে ছেলে আইন ঝাড়িতে পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাহবা দিতেন।[৬৬]

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' লেখার অনেক আগেই প্যারীচাঁদ নীলকর সাহেব-জমিদার এবং রায়তদের পারস্পরিক সংঘাতের চিত্র এঁকেছেন। নীলকরদের অত্যাচার এবং ইংরেজ বিচারকদের চূড়ান্ত অন্যায় ও পক্ষপাতিত্বকে ধিক্কার দিয়েছেন। তাঁর বর্ণিত জমিদার প্রজার সম্পর্কও অনেকটা অভ্রান্ত। শোষণের কথা অস্পষ্টাঙ্গিতে কিন্তু তীব্র ভাষায়ই উচ্চারিত। তবে 'আলালের ঘরের দুলালে' খুব বেশি স্পষ্ট ইংরেজদের বিচার ব্যবস্থা। কয়েকবারই কোর্ট, কাছারি, জুরি, বিচারক, উকিল মুহুরি, থানা পুলিস, হাজত-এর কথা আছে। দ্বীপান্তরের প্রসঙ্গও এসেছে।

বাবুরামবাবুর যশোহরের তালুক ছিল সব থেকে লাভ জনক। তাঁর মৃত্যুর পর ঋণের দায়ে ভারাক্রান্ত হয়ে মতিলাল তালুক থেকে টাকা আদায়ের জন্য দলবলসুদ্ধ সেখানে যায়। যশোহরে নীলকরের জুলুম বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিন এক প্রজা তাকে জানায় —

> ... কুঠেল বেটা যোদের সর্বনাশ করলে বেটা সরে জমিতে আপনি এসে যোদের বুননি জমির উপর লাঙ্গল দিতেছে ও হাল গরু সব ছিনিয়ে নিয়েছে ...।[৬৭]

নীলকর ও জমিদার দুই পক্ষের লোকেদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। নীলকর সাহেব জানেন —

> তাহাকে কাবু করা বড় কঠিন, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ তাঁহার ঘরে সর্ব্বদা আসিয়া খানা খান ও তাঁহাদিগের সহিত সহবাস করাতে পুলিসের ও আদালতের লোক তাঁহাকে যম দেখে, আর যদিও তদারক হয়, তবু খুনী মোকদ্দমায় বাহির জেলায় তাঁহার বিচার হইতে পারিবে না। কালা লোক খুন অথবা অন্যপ্রকার গুরুতর দোষ করিলে যফস্বল আদালতে তাহাদিগের সদ্যবিচার হইয়া সাজা হয়, গোরা লোক ঐ সকল দোষ করিলে সুপ্রীম কোর্ট চালান হয়, তাহাতে সাক্ষী অথবা ফরিয়াদিয়া ব্যয়, ক্লেশ ও কর্ম্মক্ষতির জন্য নাচার হইয়া অস্পষ্ট হয়, সুতরাং বড় আদালতে উক্ত ব্যক্তিদের মোকদ্দমা বিচার হইলেও ফেঁসে যায়।[৬৮]

পরবর্তীকালে নীলকরদের এই অত্যাচারের স্পষ্ট রূপায়ণ পাওয়া যায় দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষিতে প্যারীচাঁদ নীলকরদের যে প্রতিচ্ছবি এখানে তুলে ধরেছেন তা একান্ত বাস্তব।

গ্রন্থে কলকাতা ও হুগলি দুটি স্থানের আদালতের দৃশ্য লক্ষণীয়। এগুলো ইংরেজ শাসনের বিচার ব্যবস্থার বাস্তবরূপের বিদ্রূপাত্মক চিত্রণের দিক থেকে অসাধারণ। কলকাতার আদালতের দৃশ্য উপস্থাপনের আগে তার পটভূমি রূপে প্যারীচাঁদ কলকাতা শহরের আদি বৃত্তান্ত স্মরণ করেছেন —

> কোম্পানীর কুঠি প্রথমে হুগলিতে ছিল; তাঁহাদিগের গোমাস্তা জাবচারনক সাহেব সেখানকার ফৌজদারের সহিত বিবাদ করেন, তখন কোম্পানীর এত জারিজুরি চল্‌তো না, সুতরাং গোমাস্তাকে হুড়ো খেয়ে পালিয়ে আসিতে হইয়াছিল। জাবচারণকের বারাকপুরে এক বাটী ও বাজার ছিল, ... তিনি নূতন কুঠী করিবার জন্য উলুবেড়িয়া গমনাগমন করিয়াছিলেন ও তাহার ইচ্ছাও হইয়াছিল যে, সেখানে কুঠী হয়, ... জাবচারণক বটুকখানা অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল, তাহার তলায় বসিয়া মধ্যে মধ্যে আরাম করিতেন ও তামাকু খাইতেন, সেই স্থানে অনেক ব্যাপারীরাও জড় হইত। ঐ গাছের ছায়াতে তাহার এমনি

> যায়া হইল যে, সেই স্থানেই কুঠী করিতে স্থির করিলেন। সুতানুটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই গ্রাম একেবারে খরিদ হইয়া আবাদ হইতে আরম্ভ হইল, পরে বাণিজ্য নিমিত্ত নানাজাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল ও কলিকাতা ক্রমে ক্রমে সহর হইয়া গুলজার হইতে লাগিল।[৬৯]

গুলজার শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্যারীচাঁদ মিত্র ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্রে নানাজাতীয় অজস্র লোকের আগমনে কলকাতা যেভাবে কোলাহলময় বাণিজ্য প্রধান শহরে পরিণত হয়েছিল তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন, এদেশের ভাষা ও রীতি ব্যবহার, ফৌজদারী আইন, সুপ্রীকোর্টের ভাষ্যকাররূপে মোকদ্দমা পরিচালনা ইত্যাদির পরিচয় দিয়েছেন। আদালতের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন ——

> গীর্জ্জর ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল। সারজন, সিপাই, দারোগা, নায়েক, ফাঁড়িদার, চৌকিদার ও নানা প্রকার লোকে পুলিস পরিপূর্ণ হইল। কোথাও বা কতকগুলা বাঈওয়ালী ও বেশ্যা বসিয়া পানের ছিবে ফেলেছে - কোথাও বা কতকগুলা লোক মারি খেয়ে রক্তে কাপড় সুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে - কোথাওবা কতক কতকগুলো চোর অধোমুখে একপাশে বসিয়া ভাবছে - কোথাও বা দুই-এক-জন টুয়ে বাধা ইংরেজীওয়ালা দরখাস্ত লিখছে - কোথাও বা ফরিয়াদীরা নীচে উপরে টঙস টঙস করিয়া ফিরিতেছে, - কোথাও বা সাক্ষী সকল পরস্পর ফুসফুস করিতেছে - কোথাওবা পেশাদার জামিনেরা তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে - কোথাওবা উকিলদিগের দালাল ঘাপটি মেরে জাল ফেলিতেছে - কোথাও বা উকিলেরা সাক্ষীদিগের কানে মন্ত্র দিতেছে - কোথাও বা আমলারা চালানী মোকদ্দমা টুকছে - কোথাও বা সারজনেরা বুকের ছাতি ফুলাইয়া মস্‌মস্ করিয়া বেড়াচ্ছে - কোথাও বা সর্দ্দার সর্দ্দার কেরাণীরা বলাবলি করছে - এসাহেবটা গাধা - ও সাহেব পটু -এ সাহেব নরম - ওসাহেব কড়া- কালকের ও মকদ্দমাটার হুকুম ভাল হয় নাই। পুলিস গস্‌গস্ করিতেছে-সাক্ষাৎ যমালয় - কার কপালে কিহয়, সকলেই সশঙ্ক।[৭০]

সমগ্র বর্ণনাটি। 'সাক্ষাৎ যমালয়' এই রূপকেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অতি দরিদ্র ইংরেজিওয়ালা দরখাস্ত লেখক, শলাপরামর্শরত সাক্ষী, তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষারত পেশাদার জামিনদার,

শিকার ধরার জন্য ওঁৎ পেতে থাকা উকিলদের দালাল, বুকের ছাতি ফুলিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে পরিভ্রমণরত পুলিশ সার্জেন্ট - লেখকের নিপুণ পর্যবেক্ষণে এই মানুষগুলোর মধ্য দিয়ে আদালতের পরিবেশ তার সমগ্র বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে অ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এর পরে ঠকচাচার চক্রান্তে বরদাপ্রসাদ খুনের মামলায় অভিযুক্ত হয়ে হুগলির ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে আসেন। এই দৃশ্যে প্রশাসন ও বিচারের সমালোচনা আরও প্রত্যক্ষ। বরদাবাবু বেণীবাবু ও রামলালকে নিয়ে একটি গাছের তলায় বসে আছেন, তখন —

> তাঁহার নিকট দুই একজন আমলা-ফয়লা আসিয়া ঠারে ঠোরে চুক্তির কথা কহিতেছে, কিন্তু বরদাবাবু তাতে ঘাড় পাতেন না; তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা বলিতেছে, 'সাহেবের হুকুম বড় কড়া - কম্মকাজ সকলই আমাদিগের হাতের ভিতর - আমরা যা মনে কির তাহাই করিতে পারি - জবানবন্দী করান আমাদিগের কর্ম্ম- কলমের মারপেঁচে সকলই উল্টে দিতে পারি, কিন্তু রুধির চাই - তদ্বির করতে হয় তো এই সময় করা কর্ত্তব্য, একটা হুকুম হইয়া গেলে আমাদিগের ভাল করা অসাধ্য হইবে। ৭৪

কাছারির আমলা ফয়লা অর্থাৎ কেরাণীদের এই সমস্ত কথাতেই কাছারির দুর্নীতি কলুষিত পরিবেশ আমাদের কাছে বাস্তব চেহারায় ধরা পড়ে। তিনটে বেজে গেলেও সাহেবের দেখা পাওয়া গেল না। কাছারি যখন ভাঙাঁর মুখে তখন তিনি আবির্ভূত হলেন—

> সাহেব কাছারি প্রবেশ করিবামাত্রই সকলে জমি পর্য্যন্ত ঘাড় হেঁট করিয়া সেলাম বাজাইল। সাহেব সিস্ দিতে দিতে বেঞ্চের উপর বসিলেন - হুকাবরদার আলবোলা আনিয়া দিল, তিনি মেজের উপর দুই পা তুলিয়া চৌকিতে শুইয়া পড়িয়া আলবোলা টানিতে-ছেন ও লেবণ্ডর ওয়াটার মাখান হাত রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতেছেন। ন্যাজিরদপ্তর লোকে ভরিয়া গেল, জবানবন্দিনবিস হন হন করিয়া জবানবন্দী লিখিতেছে, কিন্তু যাঁহার কড়ি, তাঁহার জয় -

> সেরেস্তাদার জোড়া গায়ে, খিড়কিদার পাগড়ী মাথায়, রাশি রাশি মিছিল লইয়া সাহেবের নিকট গায়েনের সুরে পড়িতেছে, সাহেব খবরের কাগজ দেখিতেছেন ও আপনার দরকারী চিঠিও লিখিতেছেন, এক একটা মিছিল পড়া হলেই জিজ্ঞাসা করেন, "ওয়েল, কেয়া হুয়া ?' সেরেস্তাদারের যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া বুঝান ও সেরেস্তাদারের যে রায়, সাহেবেরও সেই রায়।[৭২]

প্যারীচাঁদ মিত্র বাস্তব জগৎ থেকেই সেকালের আদালতের সত্য প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন।

'আলালের ঘরের দুলাল'এ নাপিতের স্ত্রীর উক্তিতে নিতান্ত সাধারণ পরিবারের গৃহিনীর দায়দায়িত্বের বোঝায় বিড়ম্বিত জীবনের বাস্তব ছবি লক্ষণীয়। নাপিতের মুখে বাবুরামবাবুর দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা শুনে নাপ্‌তানি চমকে উঠে বলে —

> ওমা, আমি কোজাব ? বুড়ো টোক্কা আবার বে করবে ? আহা ! এমন সতী লক্ষ্মী, তার গলায় আবার একটা সতীন দেখে দেবে - মরণ আর কি। ও মা, পুরুষ জাত সব করতে পারে।[৭৩]

বাস্তবজীবন রসিক প্যারীচাঁদের এই বর্ণনায় কৌতুকের আমেজ অনুভব করা যায়। এ অংশে সমাজের নীচস্তরের নারী-পুরুষের বাস্তব ও জীবন্ত সংলাপ ও তাদের মনোভাব প্রকাশিত। তাছাড়া ঠকচাচা ও ঠকচাচীর কথোপকথন, মোফদা প্রমদার কথোপকথন থেকেও এই বাস্তবতা প্রতিপন্ন হয়। সামাজিক জীবনের বিবিধ উপকরণের পরিচয় প্রসঙ্গে কাহিনীর সূত্রকে তিনি নানা পথে ঘুরিয়েছেন। সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে বিয়ের ঘোঁট, বৃদ্ধের দ্বিতীয় বিয়ে বা বিবাহজীবী কুলীনের আচরণ নিয়ে রঙ্গের মাধ্যমে বিদ্রূপ করেছেন। প্রসাদলোভী ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য করে তাঁর বিদ্রূপ অনেক বেশি ধারধার।

যতিলাল গ্রেপ্তার হবার পর তার মুক্তিলাভের ব্যবস্থার জন্য বাবুরামবাবু ঠকচাচাসহ কলকাতায় যান। বৈদ্যবাটীতে সূর্য্যোদয়ের ধুম পড়ে যায় যতিলালের জন্য। যতিলালকে নিয়ে ফেরার পথে তারা ঝড়ের সম্মুখীন হন। তাদের পৌঁছোনোর বিলম্ব

দেখে ব্রাহ্মণেরা পরস্পর বলা বলি করতে থাকেন ঝড়ের রাতে বাবুরামবাবু যদি নৌকোয় উঠে থাকেন তবে ঝড়ে নৌকো বিধ্বস্ত হয়েছে। ফলে তাদের প্রাপ্তির দফা শেষ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন ধীরে ধীরে বললেন —

> ওহে তোমরা ভাবছো কেন ? আমাদের প্রাপ্তি কেহ ছাড়ায় না - আমরা শাঁকের করাত - যেতে কাটি, আসতে কাটি। যদি কর্ত্তার পঞ্চত্ব হইয়া থাকে তবে তো একটা জাঁকাল শ্রাদ্ধ হইবে— ... আর একজন বললে - "ওহে ভাই । সে বেগুন ক্ষেত ঘুচে মূলা ক্ষেত হবে, আমরা এমন চাই যে, বসুধারার মত ফোঁটা ফোঁটা পড়ে নিত্য পাই, নিত্য খাই - এ বর্ষণে কি চির-কালের তৃষ্ণা যাবে ?"[৭৪]

তাছাড়া বাবুরামবাবুর শ্রাদ্ধে লক্ষণীয় অধ্যাপকদের ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়। ঠকচাচা তা দেখে প্রমাদ আশঙ্কায় মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে বলে —

> মুই বলি, একটা বদনা ও ছেরাদ্ধের বাত লিয়ে তোমরা কেন কেজিয়ে কর - মুই তোমাদের দুটা দুটা বদনা দিব। [৭৫]

সমাজজীবনের একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র লেখকের অবগত ছিল। তাঁর ব্যঙ্গ সেখানে তীব্র। কথ্য ভঙ্গির ভাষায় তা আরও ধারালো হয়েছে। লেখক তির্যক দৃষ্টিতে সমাজ বাস্তবতার ভগ্ন অংশের মুখোমুখি হ'তে পেরেছেন।

মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, সরকার প্রভৃতির জীবিকায় কিছু সংখ্যক হিন্দু অল্প সময়েই প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। বিপুল বিষয় সম্পত্তির অধিকারীও হয়েছিল তারা। জমিদারী পরিচালনা ও মামলা মোকদ্দমা তাদের জীবনের অঙ্গ ছিল। 'আলালের ঘরের দুলালে' এই শ্রেণীর ধনী হিন্দুদের প্রতিনিধি বাবুরামবাবু। তার মানসিকতা ও জীবনযাত্রা লেখক এখানে তুলে ধরেছেন।

তবে 'আলালের ঘরের দুলালে'র বিষয়বস্তু সমসাময়িক হলেও জীবনের রূপায়ণ এখানে বহিরঙ্গ নির্ভর। অন্তর্জীবনের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়নি। মনে রাখা প্রয়োজন অন্তর্জীবনের পরিচয় উদ্‌ঘাটনই উপন্যাসের শিল্পশৈলীর বিশেষত্ব। বস্তুত 'আলালের ঘরের দুলালে' বাস্তবচিত্র বর্ণনার উর্ধ্বে কোনো জটিল ও মহৎ জীবন চেতনা প্রকাশিত হয়নি। প্রধান চরিত্র মতিলালের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে বাইরের ঘটনার চাপে, অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নয়। উপন্যাস শুধু বাস্তবজীবনের প্রতিফলন বা প্রতিরূপ নয়। উপন্যাস শুধু মানব-জীবনের তথ্যকে চায়না, জীবনকেও বুঝতে চায়। সেজন্য সার্বজনীন সত্য উপন্যাসের অন্বিষ্ট। প্যারীচাঁদমিত্রের বাস্তব দৃষ্টি প্রখর কিন্তু জীবনজিজ্ঞাসা গভীর নয়। গভীর অর্থে দার্শনিকের দৃষ্টি নয়।

প্রকৃতপক্ষে 'আলালের ঘরের দুলালে' ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার যেটুকু সমা-লোচনা আছে তা নিতান্ত আংশিক, খণ্ডিত। তার সঙ্গে চরিত্রগুলির সম্পর্কের বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণে তার একটি সামগ্রিক রূপদানে তিনি আগ্রহবোধ দেখাননি। তিনি টেকচাঁদঠাকুরের রঙ্গব্যঙ্গময় দেশজ কথনরীতির ধারায় নক্‌শাধর্মী সমাজপর্যবেক্ষণ এবং কাহিনী কথকের শিক্ষাতত্ত্ব, হিন্দুধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ভাবাদর্শের উপস্থাপনার মধ্যে সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সফল হয়নি, মতিলালের দুর্ব্যবহারে মা-বোনের গৃহত্যাগ, বৃন্দাবনে গমন এবং মথুরায় রামলালের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ - অতি নাটকীয়। স্বাভাবিকতা বর্জিত। মতিলালের হৃদয় পরিবর্তন সম্পর্কেও একথা বলা চলে। তা সত্ত্বেও স্বীকার্য প্যারীচাঁদ তাঁর ঐতিহাসিক চেতনার সূত্রে স্থানকাল পাত্রগত বাস্তবতায় তার কাহিনীকে স্থাপন করেছেন, যা 'আলালের ঘরের দুলালে'র পূর্ববর্তী সমকাল - এমনকি পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাসেও দুর্লক্ষ্য।

চ) আঙ্গিক বিচার

উপন্যাসের প্লট নির্মাণের বৈশিষ্ট্য বা উপস্থাপনার প্যাটার্ণের বৈচিত্র্যই উপন্যাসের আঙ্গিকে বিশ্লেষণ। 'আলালের ঘরের দুলালে'র আঙ্গিক বিশ্লেষণ করে দেখা যাক উপন্যাস হিসেবে তা

কতোটা সার্থক। আখ্যান ভাগ, চরিত্রায়ণ এবং পরিবেশন রীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'আলালের ঘরের দুলালে'র আঙ্গিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

আমরা আগেই বলেছি গ্রন্থের কাহিনী ত্রিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মুখে একটি করে দীর্ঘ ব্যাখ্যাধর্মী নাম বা পরিচয়পত্র আছে। এই পরিচিতিগুলো আসলে অধ্যায়ের ঘটনাংশের সার সংকলন। কাহিনীর ধারা হারিয়ে যেতে পারে, কিম্বা কাহিনী যথেষ্ট কৌতূহলের নয় বলে পাঠকের চোখের আড়ালে চলে যেতে পারে, তাই অধ্যায়ে অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত ঘটনায় ঘটনায় শিকল বেঁধে কাহিনীর ধারাবাহিকতা ধরিয়ে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা লেখকের ছিল। উপন্যাসের স্বরূপবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আগে যে কথা বলেছি তা আবার স্মরণ করছি। উপন্যাসে সাধারণত একটা গল্প বা কাহিনী থাকে। উপন্যাসের থীম বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপন্যাসের ঘটনা ও দৃশ্য, চরিত্রগুলির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কার্যকারণ শৃঙ্খলে বাঁধা থাকে। আর এই বিন্যাসেই উপন্যাসের কাহিনী তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ পায়।

কাহিনী সার থেকে আমরা জানতে পেরেছি বৈদ্যবাটির জমিদার বাবুরামবাবুর পুত্র যতিলাল বাল্যাবধিই উচ্ছৃঙ্খল। কুসঙ্গে মিশে এই উচ্ছৃঙ্খলতা তার আরো চরমে উঠে। শেষে কপর্দক-শূন্য হয়ে সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করার পর যতিলালের চরিত্র সংশোধিত হয়। সে সৎ পথে ফিরে আসে। অবশেষে মা-বোন, ছোট-ভাই রামলাল, বিমাতা ও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সবার সঙ্গে বৈদ্যবাটিতে ফিরে যায় এবং পরমসুখে জীবনযাপন শুরু করে - এটাই 'আলালের ঘরের দুলালে'র মূলকাহিনী। নায়ক যতিলাল যে সব ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের মধ্য দিয়েই গল্পের অবয়ব তৈরি হয়েছে। আর তার স্থান লক্ষণীয়ভাবে বৈদ্যবাটি, বালী, কলকাতা, যশোর ও বারাণসী অর্থাৎ নাগরিক অঞ্চল।

কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে' এমন কিছু অংশ আছে যেগুলোর সঙ্গে যতিলাল ঘটিত মূলকাহিনীর সম্পর্ক আপাতভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। প্রসঙ্গত - এখানে বাবুরামবাবুর দ্বিতীয়বিবাহ উল্লেখযোগ্য। বৈষয়িকবুদ্ধিসর্বস্ব বাবুরামবাবুর সৎশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অনবধানতার ফলে নৈতিকতার অভাব ছিল। তার চরিত্রবিশ্লেষণে আমরা দেখেছি, এই দ্বিতীয়বারের বিয়েটার বীজ যেন তার চরিত্রে ছিল না। পত্নী-পরায়ণা বাবুরামবাবুর দ্বিতীয়বারের বিয়েটা তার চরিত্রের পক্ষে বেমানান বলে মনে হয়। তেমনি যতিলালের জীবনকাহিনী বর্ণনায় এই অধ্যায়ের উপস্থাপনা সম্পর্কহীন। বাবুরামবাবুর বড় মেয়ে বিধবা মোক্ষদা ও দ্বিতীয় মেয়ে কুলীনের স্ত্রী প্রমদার দুঃখময় জীবন ক্ষনিকের জন্য আমাদের সামনে ভেসে উঠে। এই অংশের সংলাপ নিঃসন্দেহে হৃদয়-স্পর্শী। কৌলীণ্যপ্রথার মর্মান্তিক পরিণতি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। কিন্তু এর সঙ্গে মূলকাহিনীর সম্পর্ক কার্যকারণ সম্বন্ধে বাঁধা-একথা আমরা বলতে পারিনা।

রামলালের উপদেষ্টা বরদাপ্রসাদবাবুর বিরুদ্ধে গুমখুনের অভিযোগ, বরদা-বাবুর বিচার ও মুক্তিলাভ - এই অংশটা ও মূলকাহিনীর সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধহীন মনে হয়। তাছাড়া কোম্পানির কাগজ জাল করার অপরাধে ঠকচাচা ও বাহুল্যের গ্রেপ্তার ও বিচার, শাস্তিস্বরূপ নির্বাসনদন্ড লাভ ও জাহাজে চড়ে দ্বীপান্তরে যাত্রা - এই অংশ-গুলোকে আপাত বিচারে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। তবে ঘটনা চরিত্রের ক্রমবিকাশে ও পরিণতির সঙ্গে এর একটা ক্ষীণতম যোগ আছে। কিন্তু গ্রন্থে ২৭ সংখ্যক অধ্যায়ে বাদার প্রজার বিবরণ ও বাহুল্যের বৃত্তান্ত যতিলাল কাহিনী থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন।

নায়কের মানসিকতা এবং জীবনের বিকাশ বা পরিবর্তন উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য। এখানে যতিলালের পরিবর্তনও উপস্থাপিত হয়েছে আকস্মিকভাবে। সরল বিবৃতিতে। অথচ ঠকচাচার জালিয়াতি, অবচেতনমনের স্বীকারোক্তি, বাদার প্রজার বিবরণ বিস্তৃত বর্ণিত হয়েছে। ঠকচাচার জালিয়াতির সঙ্গী বাহুল্যকেও লেখক উপস্থাপিত করেছেন,

শান্তিস্বরূপ তার দ্বীপান্তর প্রভৃতি বিষয়ে লেখক বিস্তৃতভাবেই উপস্থাপিত করেছেন। অথচ এই অংশটা কাহিনীর সঙ্গে কার্যকারণ-সম্বন্ধে বদ্ধ নয় - যা কিনা উপন্যাসের একটা অন্যতম প্রধান শর্ত।

সমসাময়িক জীবনবোধ নিয়ে গড়ে ওঠে নভেল জাতীয় সাহিত্য। নীতিশিক্ষাদানে ও সমসাময়িক জীবনচিত্রণই 'আলালের ঘরের দুলালে'র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এই রচনার বিষয়বস্তু সমসাময়িক। কিন্তু তা জীবনরস সমৃদ্ধ হতে পারেনি। এখানে জীবনের রূপায়ণ বহিরঙ্গ নির্ভর। অথচ অন্তর্জীবনের পরিচয় উদ্‌ঘাটনই উপন্যাস শিল্পশৈলীর বিশেষত্ব। নর-নারীর প্রণয় ও দাম্পত্যজীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন জটিলতা এই অন্তর্জীবনের পরিস্ফুটনে সাহায্য করে। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাধ্যমে নরনারীর রহস্যময় অন্তর্জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

'আলালের ঘরের দুলালে' কৌলীন্য প্রথার শিকার স্বরূপ বালবিধবা যোক্ষদা। প্রমদা কুলীনের অনেক স্ত্রীর মধ্যে একজন। বাবার বাড়ীতেই সে থাকে। অর্থের প্রয়োজন হ'লে, সেই প্রয়োজনের তাগিদে ক্ষণিকের জন্য তার স্বামী আসে। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত ছিল, এখানে লেখক তা অতিক্রম করতে পারেননি। সমকালের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ভাবীকালের ইঙ্গিত তিনি দেননি - যা শক্তিমান ঔপন্যাসিকের মধ্যে আমরা লক্ষ করি।[৭৬] তাছাড়া আমরা বাবুরাম বাবুর স্ত্রীর মধ্যেও নারীর আত্ম-সচেতনতা ও আত্মঅধিকারবোধের পরিচয় পাইনা। যার মাধ্যমে নারী ও পুরুষকে সৎপথে চলবার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। আমরা মতিলালের বিবাহের খবর জানি। কিন্তু সেই স্ত্রীর সঙ্গে তার কোনো বন্ধন গড়ে উঠেছে এমন কোনো পরিচয় পাইনা। মতিলালের স্বেচ্ছা-চারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার কোনো প্রচেষ্টাও তার নেই। আর তা থাকাও সম্ভব ছিল না। নারী-পুরুষের সুস্থ দাম্পত্যজীবন তথা পণয়ের রূপায়ণ যা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য এখানে তা অনুপস্থিত।

লেখক বাবুরামবাবুর মৃত্যু, শ্রাদ্ধের ঘোট ইত্যাদি ব্যাপারে সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। যা গল্পের পক্ষে খুব আবশ্যক ছিল না। অথচ শিল্প হিসেবে উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য বিষয় অন্তর্বাস্তবতা তথা পাত্রপাত্রীর অন্তর্জীবন প্রকটনে তিনি উৎসাহবোধ করেননি। তাই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সমকালীন হ'লেও মনে হয় 'আলালের ঘরের দুলাল' বাবুর উপখ্যান ও নববাবুবিলাসের সার্থক পরিণতি।[৭৭] 'আলালের ঘরের দুলালে'র কাঠামো নববাবু থেকে ধার করা - 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এরূপ অভিযোগের কথা বলেছেন। সমাজবাস্তবতাকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে কাহিনীর মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টায় 'আলালের ঘরের দুলালে' এ প্রভাব অনুভূত হয়। তবে ভবানীচরণ তাঁর 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাসে' বাবুসমাজ ও বেশ্যাপল্লীর বাইরে তাঁর সমাজচেতনাকে প্রসারিত করেননি। প্যারীচাঁদের বইয়ে ব্যাপকতর সমাজবাস্তবতা আয়ত্ত।[৭৮] প্যারীচাঁদ আসলে নৈতিক আদর্শবাদের একটি পথের খোঁজ দিতে চেয়েছেন এখানে।

উৎছৃঙখল মতিলালের বেপরোয়া চরিত্রের বিপরীতে সুশৃঙখল অর্থাৎ নীতিবোধ ও নম্রচরিত্র রামলালকে অঙকন করেছেন - মতিলালের জীবনকথাকে সুস্পষ্ট করে তোলবার জন্য। বস্তুত নীতিশিক্ষাদান তাঁর রচনার মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় বরদাপ্রসাদবাবু ও রাম-লালের বহুল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রামলালের সুশিক্ষা এবং নৈতিকতার উৎসস্বরূপ আমরা বরদাবাবুর পরিচয় চাই। লেখকের নৈতিকতা প্রতিপাদনের জন্যই আদর্শ এবং নৈতিকতার প্রতিভূ বরদাপ্রসাদ রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বরদাবাবু-রামলালের চরিত্র পরিকল্পনায় ও মতিলালের হৃদয় পরিবর্তনে 'আলালের ঘরের দুলালে'র খীষের উপস্থাপনা অত্যন্ত দুর্বল। খীষের অপর অংশ বাবুরাম-মতিলাল-ঠকচাচা বাঞ্ছারাম বজ্রেশ্বর প্রভৃতি চরিত্র এবং তাদের জগতের বাস্তবতার তুলনায় বরদাবাবু রামলাল এবং তাদের জগৎ নীরক্ত। বাস্তবতার অবয়বহীন - যা আমরা লক্ষ না করে পারিনা। তাছাড়া নীতির প্রশ্নে ও ঘটনা বাহুল্যে রচনাটির বিষয়গত ঐক্যও ক্ষুন্ন হয়েছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা 'আলালের ঘরের দুলালে'র রূপকথাধর্মী উপসংহার। গ্রন্থের শেষবাক্য - "আমার কথাটি ফুরাল, নটে গাছটি মুড়াল।"[৭৯] এরূপ উপসংহার ঠাকুরমার ঝুলি বা ঠাকুরদার ঝুলি - প্রভৃতি লোককথার প্রান্তিক পদ্যই রচনাটিকেই মনে করিয়ে দেয়। গল্প শেষ করার ধরণটি নভেল'এর নিজস্ব শিল্প বিশেষত্বকে ক্ষুন্নই করেছে। লেখক 'আলালের ঘরের দুলালের ইংরেজি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন : "The above original Novel in Bengali being the first of the kind is now submitted to the public with considerable diffidence." [৮০]

এর থেকে বোঝা যায় প্যারীচাঁদ আগ্রহভরে বাংলায় নভেল রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি নভেলজাতীয় শিল্পশৈলীর আঙ্গিক এখানে দুর্বল। আঙ্গিকগত এই দুর্বলতার ফলে তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'কে আমরা সার্থক উপন্যাস বলতে পারিনা।

তবে তার উপন্যাসের আঙ্গিকগত দুর্বলতার বোধ হয় কারণও ছিল। প্রথমতঃ তার সামনে যথার্থ আদর্শ বাংলা উপন্যাস ছিল না। তাছাড়া মূলকাহিনী গঠনে উপকাহিনী বা শাখাকাহিনীর অত্যধিক বিস্তার ঘটেছে। উপরন্তু এগুলোতে গুরুত্বও আরোপ করা হয়েছে বেশি। এর ফলে গল্পের গতিতে শ্লথতা এসেছে।

তাছাড়া নির্বিশেষ কালের ইঙ্গিতে গ্রন্থটি খুবই ভারাক্রান্ত। প্রথম ১০টি পরিচ্ছেদে প্রায় দু'বছরকাল অতিক্রান্ত। কিন্তু তারপর কতদিনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তার হিসেব পাওয়া সহজ নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় —

১। 'অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন করিলেন' (পৃ.১৩০)

২। 'বাবুরামবাবুর অবস্থা পূর্বে বড় মন্দ ছিল।' (পৃ.১৩০)।

৩। 'বাবুরামবাবু ভাবিলেন যে পারসীর চলন উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইংরাজী পড়ান ভাল।'(পৃ.১৩৩)

এই পরিচ্ছেদেই 'আষাঢ়'-শ্রাবণ' মাসের উল্লেখ আছে কিন্তু সন বা তারিখের উল্লেখ নেই। তাছাড়া পূর্ব প্রসঙ্গ টেনে ইংরেজদের কলকাতায় আগমন, সুপ্রীকোর্ট স্থাপন ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। সন তারিখের উল্লেখ না থাকলেও ইতিহাসের সূত্র ধরে এখানে সময়ের ধারণা দেওয়া হয়েছে।

৪। 'সময় জলের মত যায় - দেখিতে দেখিতে সোমবার হইল।'(পৃ·১৫৬)

৫। 'শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মেটের কোলে মতিলালের বয়েস ষোল বৎসর হইল।'(পৃ·১৭০)

৬। 'কিছুকাল এই প্রকারে ক্ষেপণ হইল।'(পৃ·২৪১)

৭। 'অনন্তর রামলালের বিবাহ হইল ও দুই ভাইয়ে অতিশয় সপ্রীতে মায়ের ও অন্যান্য পরিবারের সুখবর্ধক হইয়া, পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।' (পৃ·২৫৯)

বলাবাহুল্য কালের এরূপ নির্বিশেষ ব্যবহারও 'আলালের ঘরের দুলালে'র আঙ্গিকগত ত্রুটি।

ছ) সামগ্রিক মূল্যায়ন

বঙ্কিমচন্দ্র একটি ইংরেজি প্রবন্ধে'আলালের ঘরের দুলালকে বাংলাভাষার প্রথম নভেল বলে অভিহিত করেছেন।[৮১] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও গ্রন্থটিকে বাংলাভাষার প্রথম উপন্যাস বলেছেন।[৮২] শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন : "আলালের ঘরের দুলাল একখানি উপন্যাস। কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদারের প্রণীত "বিজয়বসন্ত" ও টেকচাঁদঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস।"[৮৩] সর্বোপরি লেখক নিজেও গ্রন্থটিকে প্রথম নভেল বলেছেন। উপন্যাসের স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে'আলালের ঘরের দুলাল'এর উপন্যাস গুণ নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

'আলালের ঘরের দুলালে'র বাস্তবতার আলোচনায় আমরা দেখেছি রচনাটিতে সমকালীন সমাজজীবনের বাস্তবচিত্র পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু ধারাবাহিকতা থাকা সত্ত্বেও লেখকের বাস্তবচেতনা তথা ঘটনার যথার্থ কার্যকারণ সূত্র প্রস্ফুটিত হয়নি। রচনাটির আঙ্গিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি নীতির প্রশ্নে ও ঘটনা বাহুল্যে বিষয়গত ঐক্যও ক্ষুন্ন হয়েছে। আসলে সমাসময়িক কলকাতার নববাবুদের জীবনযাত্রার চিত্র রচনাই ছিল লেখকের লক্ষ্য। নরনারীর অন্তরঙ্গ জীবনের উদ্‌ঘাটনও এখানে উপেক্ষিত। উপেক্ষিত হয়েছে উপন্যাসের উপজীব্য নরনারীর অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ববেদনার উৎস প্রেম। পক্ষান্তরে এতে বাবুসমাজের নারী বিলাসিতার অঙ্গরূপে লাম্পট্য বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে।

নায়কের ব্যক্তিত্ব নিতান্ত অপরিস্ফুট। লক্ষণীয়ভাবে নারীচরিত্রগুলো কাহিনীর পক্ষে অনেকটাই অবান্তর। তাছাড়া ঘটনার প্রবাহ অনুযায়ী কাহিনী ধারাবাহিক নয়। তাই বিষয়ের গ্রন্থনা ঢিলেঢালা; অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে গ্রথিত নয়। সর্বোপরি স্মরণীয় রূপকথা বা উপকথার ঢং-এ গ্রন্থসমাপ্তি। 'আলালের ঘরের দুলালে'র এই সমস্ত দুর্বলতাগুলোর দিকে লক্ষ করে একে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলতে কুণ্ঠাবোধ করছি।

গ্রন্থটির মূলসুর হ'লো চাপা হাস্যরস।[৮৪] আখ্যান বস্তুর নির্বাচন ও পরিকল্পনায় প্যারীচাঁদ তার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গচিত্র রচয়িতা ভবানীচরণের কাছে অল্পস্বল্প ঋণী বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। বস্তুত "হাস্যরস জোগান দিবার জন্যই আলালের ঘরের দুলালের অনেকগুলি প্রস্তাব মূলকাহিনীর সঙ্গে অসম্বন্ধ হইলেও সংযোজিত হইয়াছিল।"[৮৫] কলকাতার সমকালীন শিক্ষা বিভ্রাটের পরিচয়টি তিনি যে ভাবে অঙ্কিত করেছেন, প্রসঙ্গত তা উল্লেখযোগ্য —

> প্রত্যেক ক্লাসের প্রত্যেকবালকের প্রতি সমান তদারক হইত না - ভারি ভারি বহি পড়িবার অগ্রে সহজ সহজ বহি ভালরূপে বুঝিতে পারে কিনা, তাহার অনুসন্ধান হইত না - অধিক বহি ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই স্কুলের গৌরব হইবে,

> এই দৃঢ় সংস্কার ছিল - ছেলেরা মুখস্থ বলে গেলেই হইল - বুঝুক বা না বুঝুক, জানা আবশ্যক বোধ হইত না এবং কি কি শিক্ষা করাইলে উত্তরকালে কর্ম্মে লাগিতে পারিবে, তাহারও বিবেচনা হইত না। এমত স্কুলে যে ছেলে পড়ে, তাহার বিদ্যাশিক্ষা কপালের বড় জোর না হইলে হয় না।[৮৬]

আদর্শ শিক্ষার তথ্য সমৃদ্ধ এই বর্ণনা কৌতুকের সৃষ্টি করে। এরই সঙ্গে মূর্খ শিক্ষকের বিবরণেও কৌতুকের সৃষ্টি হয় —

> বটতলার রত্নেশ্বর বাবু কালুস সাহেবের সোনার কাঠি রূপার কাঠি ছিলেন। তিনি যাবতীয় বড়মানুষের বাড়ীতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন, 'আপনার ছেলের আমি সর্ব্বদা তদারক করিয়া থাকি - মহাশয়ের ছেলে, না হবে কেন। সে তো ছেলে নয়, পরশ পাথর। স্কুলে উপর উপর ক্লাসের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন, তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। একথা প্রকাশ হইলে ঘোর অপমান হইবে, এজন্যে চেপে চুপে রাখিতেন। বালকদিগকে কেবল মখন পড়াইতেন - মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ডিক্সনারী দেখ। ছেলেরা যাহা তরজমা করিত তাহার কিছু না কিছু কাটাকুটি করিতে হয়, সব বজায় রাখিলে মাষ্টারগিরি চলে না, কার্য্য শব্দ কাটিয়া কর্ম্ম লিখিতেন, অথবা কর্ম্ম শব্দ কাটিয়া কার্য্য লিখিতেন - ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তোমরা বড় বে-আদব, আমি যাহা বলিব, তাহার উপর আবার কথা কও ?[৮৭]

এরূপ খণ্ড খণ্ড বাস্তব চিত্রের পরিচয় প্রচুর মেলে তাঁর রচনায়, যেগুলো একটা চাপা হাস্যরসই সৃষ্টি করে। এরূপ খণ্ড খণ্ড বাস্তবচিত্রের প্রতি লক্ষ করেই সম্ভবত সমালোচক বলেছেন : "আসলে আলালের ঘরের দুলালও বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক সামাজিক নকসা। জটিল-বিচিত্র গ্রন্থিবদ্ধ জীবন - সুভাবকে প্রাণস্পন্দিত অখণ্ডতায় তুলে ধরবার মত গভীর উপলব্ধি প্যারীচাঁদের ছিল না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সৃষ্টা নয়, - দ্রষ্টা।"[৮৮]

তাঁর সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীরা অবিমিশ্র ভালো বা মন্দের সমষ্টি। দু'একটি চরিত্রে সামান্য গতিশীলতা চোখে পড়ে। চরিত্রগুলির প্রবৃত্তিজনিত মানসিক দ্বন্দ্ব প্রায় অনুপস্থিত। তাছাড়া চরিত্রের পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া যে স্বাভাবিকতাহীন তা আগেই বলা হয়েছে। কোনোপ্রকার উত্তেজনা বাইরে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও অন্তরে তার প্রভাব পড়েনি। অধিকাংশ চরিত্রই স্থির এবং টাইপধর্মী। একমাত্র ঠকচাচার চরিত্রই ব্যতিক্রম। ব্যক্তি বনাম সমাজ এ ধরণের দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া চরিত্রের পরিবর্তনে সহায়তা করেনা। চরিত্রের যেটুকু রূপান্তর ঘটে, তা যেন লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যই। এসব ত্রুটির দিকে লক্ষ করে 'আলালের ঘরের দুলাল'কে আমরা সার্থক উপন্যাস বলতে পারছিনা।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লক্ষণীয় মতিলালের মা ও বোন প্রমদা অতি কষ্টে দিনপাত করছে। একমুঠো অন্ন পর্যন্ত তাদের জুটছেনা। মতিলালের মা তার কোনো ছেলের খবর তখন পর্যন্ত জানতো না। দুঃসহ কষ্টে পড়ে বাড়ি ছেড়ে আসার জন্য খেদ প্রকাশ করছেন। পুত্রবধূর কথা ভেবে, ছেলেদের কথা ভেবে তাঁর অশ্রুবিসর্জন হচ্ছে। দুঃসহ কষ্টে তাঁর একটু তন্দ্রা এলো। তখন তিনি স্বপ্ন দেখছেন —

> যেন একটি পীতবসন নবকিশোর তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিতেছেন - "মা! তুই আর কাঁদিস না - তুই বড় পুণ্যবতী - অনেক দুঃখী কঙ্গালীর দুঃখ নিবারণ করিয়াছিস - তুই কাহার ভাল বৈ কখন মন্দ করিস নাই - তোর শীঘ্র ভাল হবে - তুই দুই পুত্র পাইয়া সুখী হইবি।[৮১]

এরপর আমরা দেখেছি তিনি দুই পুত্রকে ফিরে পেলেন এবং সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। সবাইকে নিয়ে তিনি পরমসুখে দিনপাত শুরু করেন। তবে লক্ষ করবার বিষয় হ'লো নিজের আসন্ন সুখের কথা তিনি অলৌকিক ভাবে জানতে পারলেন। তার এই স্বপ্নদর্শণ বা অলৌকিকতা কার্যকারণ সম্বন্ধে প্লটে গ্রথিত নয়। বরং তা লোকসাহিত্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। লোকসাহিত্যে অনেক সময় দেবদেবীরা এসে মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের নানান ঘটনা

জানিয়ে যান। কিংবা তার কর্তব্যবিষয় সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেন। লৌকিক জগৎকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই প্যারীচাঁদ এখানে এনেছেন লোকসাহিত্যসুলভ অলৌকিকতা। অলৌকিকতার ব্যবহারে রচনা অনেক সময় উপভোগ্য হয়ে উঠে।[১০] তবে এখানে লেখকের কৌশলগত নিপুণতার পরিচয় নেই। আসলে 'আলালের ঘরের দুলালে' সমাজচিত্র ও চরিত্র অংকনই উদ্দেশ্য। এখানে সমস্যা সমাধানের কোনো প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায় না - যা উপন্যাস তথা নভেলের বৈশিষ্ট্যকে ম্লান করে। প্রসঙ্গত সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য -
" ... আলোলের ঘরের দুলাল প্রধানত নক্শাধর্মী রচনা এবং বাস্তবপন্থী উপন্যাসের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়ায়।" [১১] 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্বন্ধে সুশীলকুমার দে বলেছেন : "It sketches a Rake's Progress by means of the story of a rich man's spoilt son named Matilal and his ultimate reform."[১২]

এর পরেও 'আলালের ঘরের দুলাল'কে সম্পূর্ণ উপন্যাস বলা সমীচীন মনে হয়না। কিন্তু তা হলেও বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হলেও এর মধ্যে সমকালীন শহর গঞ্জের, স্কুল-আদালতের, পারিবারিক, সামাজিক উৎসব পার্বণের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তা ছাড়া "যে ভাষা সকল বাঙালির বোধগম্য এবং সকল বাঙালি কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথমে তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভান্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভান্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।" [১৩] বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম চেতনা ও কালপ্রবাহের সম্পর্ক অনুধাবন করেছিলেন। যদিও এর সার্থক রূপদানে তিনি সক্ষম হননি। উপন্যাসের উদ্ভবে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভূমিকা হ'লো সূর্যোদয়ের পূর্বে উষা-মুহূর্তের মতো।

'আলালের ঘরের দুলাল' যথার্থ উপন্যাসের কোঠায় উঠতে না পারলেও সরস কৌতুক, বাক্‌রীতির চাপল্য-চাতুর্য, টাইপ চরিত্র সৃষ্টি ও বাস্তবধর্মী ঘরোয়া কাহিনী হিসেবে উপন্যাসের পূর্বাভাস বলেই গৃহীত হবে।[১৪] প্রকৃতপক্ষে 'আলালের ঘরের দুলাল' তার পূর্ববর্তী রচনা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'এর তুলনায় অধিকতর উপন্যাসোচিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সার্থক উপন্যাস হ'য়ে ওঠার অনেক বেশি সম্ভাবনা এতে ছিল। এদিক থেকে উপন্যাসের ক্ষেত্রপ্রস্তুতির ইতিহাসে নভেল রচনার প্রয়াস হিসেবে 'আলালের ঘরের দুলাল' বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্রনির্দেশ

১। 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস। প্যারীচাঁদের অন্যান্য পুস্তকগুলি - 'মদ খাওয়া বড় দায়', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা', প্রভৃতি - অল্পবিস্তর উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত, তাহারা সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়, কেবল উপন্যাসের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টিমাত্র।"
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৮৮, পৃ·২৮

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ·২২৫

৩। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : সাহিত্যের রূপ-রীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ·২০৭

৪। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : চিরায়ত সাহিত্য সংগ্রহ(১ম খণ্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ·১৩০-১৩১

৫। তদেব, পৃ·১৩১

৬। তদেব, পৃ·২৪০-২৪১

৭। শ্যামলকুমার সেনগুপ্ত : নায়কের বিবর্তন : বাংলা উপন্যাসে, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ·১৪

৮। ফুলমণি ও চরিত্র পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। ভারতী সেন(মিত্র) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস : লোকসাহিত্যের ব্যবহার (প্রাক-বঙ্কিম পর্ব) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৮৯, পৃ·১৮

১০। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·২০৮

১১। আশুতোষ ভট্টাচার্য : প্রাগুক্ত, পৃ·২২৫

১২। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·২৩০

১৩। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ·৭৭

১৪। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·২৩৬

১৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ·২৮

১৬। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·১৩৫

১৭। তদেব, পৃ·১৪৬

১৮। তদেব, পৃ·১৭০

১৯। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ; ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ·৭৬-৭৭

২০। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·১৮২

২১। তদেব, পৃ·২১৮-২১৯

২২। তদেব, পৃ·২৩৬

২৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য : প্রাগুক্ত, পৃ·২২৬

২৪। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·১৪৬

২৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্যারীচাঁদ রচনাবলী, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭১, ভূমিকা, পৃ·৮

প্যারীচাঁদ মিত্র "১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় স্ত্রী সমাজের মানসিক, নৈতিক ও পারিবারিক উৎকর্ষের জন্য 'মাসিকপত্রিকা' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সুশিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের জন্য প্রকাশিত হতো। এতে "কখনও কখনও একেবারে ঘরোয়া ভাষায় গল্প ও রূপকের ছলে সমাজ ও পরিবারে স্ত্রীলোকের ভূমিকা সম্পর্কে নানা নিবন্ধ ও কাহিনী প্রকাশিত হত।"

২৬। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·১৯১

২৭। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩ পৃ·৭৩

২৮। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত, পৃ·৭১

২৯। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : প্যারীচাঁদমিত্র সমাজচিন্তা ও সাহিত্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ·৪২৮

৩০। তদেব, পৃ·৪২৮

রামমোহন তাঁর ব্রাহ্মধর্মে পৌত্তলিকতা বা ঈশ্বরের সাকাররূপের উপাসনা বর্জন করে ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ভক্তিভাব প্রভৃতির মাধ্যমে নিরাকার পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের উপাসনা প্রবর্তন করেন। পূজাপার্বন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অর্থ ও শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে নৈতিক সদাচার এবং আধুনিক সমাজ গঠনের উপযোগী কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে সামাজিক কল্যাণ সাধণের আদর্শকে তুলে ধরেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার মাধ্যমে রামমোহনের এই আদর্শকে নূতনভাবে উজ্জীবিত করেন। প্যারীচাঁদ সেই ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

৩১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্যারীচাঁদ রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ভূমিকায় উদ্ধৃত, পৃ·১৪

৩২। ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, তারিখ অনুল্লিখিত, পৃ·১০২

৩৩। কাঞ্চনবসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·১৩৫

৩৪। তদেব, পৃ·১৩৯-১৪০

৩৫। তদেব, পৃ·১৪০-১৪১

৩৬। তদেব, পৃ·১৪১

৩৭। তদেব, পৃ·১৭৬-১৭৭

৩৮। তদেব, পৃ·১৮০

৩৯। তদেব, পৃ·২৪২

৪০। তদেব, পৃ·১৮০

৪১। সত্যেন্দ্রনাথ রায় : বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৯৪ পৃ·৯০

৪২। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : সাহিত্যের রূপ-রীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ·২২৭

৪৩। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউএজ পাবলিশার্স, ১৯৮৩, পৃ·১৩১

৪৪। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্যারীচাঁদ রচনাবলী , প্রাগুক্ত, ভূমিকায় উদ্ধৃত, পৃ·৮-৯

৪৫। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, প্রাগুক্ত, পৃ·৭৮

৪৬। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·১১৫

৪৭। তদেব, পৃ·১১৬

৪৮। তদেব, পৃ·২২৮

৪৯। তদেব, পৃ·১৫২

৫০। তদেব, পৃ·২৪৬

৫১। প্রবাদগুলোর পাশে যে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হ'লো তা কাঞ্চন বসু সম্পাদিত চিরায়ত সাহিত্য সংগ্রহ(১ম খণ্ড) গ্রন্থের (আলালের ঘরের দুলাল) পৃষ্ঠা নং ।

৫২। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের লৌকিক উপাদান' গ্রন্থে আলালের ঘরের দুলালে' ব্যবহৃত বিশিষ্টার্থক শব্দের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন(১৭১)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থের পরিশেষেও প্রবাদপ্রবচনের একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। তবে লক্ষণীয় সে তালিকাগুলো আরো দীর্ঘ হবে।

৫৩। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·১৭২

৫৪। তদেব, পৃ·১৭৩

৫৫। তদেব, পৃ·১৯৬

৫৬। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : প্রাগুক্ত, পৃ·৬৮৩

৫৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সমাজ-কুচিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯১, ভূমিকা

৫৮। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : প্রাগুক্ত, পৃ·৬৭৮

৫৯। পুষ্প দত্ত: বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষা, গবেষণানিবন্ধ, (উ·ব·বি·)১৯৮২, পৃ·২৭২-৭৩

৬০। তদেব, পৃ·২৭১

৬১। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ·২৪৫

৬২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিমরচনাবলী (২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৯০, পৃ·৮৬৩

৬৩। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ·১৩০

৬৪। তদেব, পৃ·১৩০

৬৫। তদেব, পৃ·১৫০-১৫১

৬৬। তদেব, পৃ·১৩১

৬৭। তদেব, পৃ·২২৩

৬৮। তদেব, পৃ·২২৩

৬৯। তদেব, পৃ·১১৫

৭০। তদেব, পৃ·১৫৬

৭১। তদেব, পৃ·১৮১

৭২। তদেব, পৃ·১৮১-১৯০

৭৩। তদেব, পৃ·১৯৩

৭৪। তদেব, পৃ·১৬১

৭৫। তদেব, পৃ·২০৫-২০৬

৭৬। প্রসঙ্গত এখানে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের কথা উল্লেখযোগ্য। যেখানে সমকালের বাস্তবতায় ভাবীকাল পরিস্ফুট।

৭৭। অশোককুমার দে : বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ.২০২

৭৮। ক্ষেত্র গুপ্ত : প্রাগুক্ত, পৃ.১১০-১১১

৭৯। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯

৮০। ক্ষেত্র গুপ্ত : প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.১০৩

৮১। 'Bengali literature' প্রবন্ধে (১৮৭১) বঙ্কিমচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেন :

His (Pearychand Mitra's) best works is the Alaler Gharer Dulal, which may be the first novel in the Bengali language.
Bankim Chandra Chattopadhya : Bankim Rachanavali;(English); Sahitya Samsad; 1969; p.110.

৮২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতটি ১ নং পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৩। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১

৮৪। সুকুমার সেন : তদেব, পৃ.৭৬

৮৫। তদেব, পৃ.৭৬

৮৬। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১-১৪২

৮৭। তদেব, পৃ.১৪২

৮৮। ভূদেব চৌধুরী : বাংলাসাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ.৩৫১

৮৯। কাঞ্চন বসু সম্পাদিত : প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৩

১০। এই অলৌকিকতার ব্যবহার আমরা পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় পাই। অলৌকিকতার ব্যবহারে তিনি তাঁর রচনাকে উপভোগ্য করে তুলেছেন।

১১। দেবীপদ ভট্টাচার্য : উপন্যাসের কথা, জি.এ.ই.পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ.১৪১

২২। De, S.K. Bengali literature in the 19th century, Firma K.L. Mukhopadhyaya - Publishers, Calcutta, 1962, p.604.

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ.৮৬৩

২৪। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্যারীচাঁদ রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ.২৩